৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২
১৩ই আশ্বিন, ১৪২৯
গল্পগুচ্ছ পূজাবার্ষিকী
১৪২৯
পরিচালনায় - গল্পগুচ্ছ পরিবার

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা :-

১৩ই আশ্বিন,১৪২৯

৩০এ সেপ্টেম্বর, ২০২২

পরিচালনায় –

গল্পগুচ্ছ পরিবার

গল্পগুচ্ছ টেলিগ্রাম চ্যানেল

- **সম্পাদনা** – বন্দ্যোপাধ্যায়
- **সহযোগীতায়** – অমিত কুমার গস্বামি,অহনা দে ও সন্দীপ জানা
- **প্রচ্ছদ শিল্পী** – অয়ন কুমার হালদার
- **পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি শিল্পী**- বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ -

গল্পগুচ্ছ পরিবারের সকল সদস্যকে এবং আপদকালে কর্মরত প্রতিটি মানুষকে

DISCLAIMER

সূচিপত্র

বড়গল্প

ছোটগল্প

অনুগল্প

বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

১। যত্নে অযত্নে সৌভিক – নিরুত্তর

২। বিভিন্ন শরের ভিন্ন স্বর – শুভদীপ ঘোষ

কবিতা

১। শরতের কথা – সুস্মিত সাহা

২। বৃষ্টি – সায়কদীপ দাস

৩। ভবঘুরে জীবন – ঈপ্সিতা সাহা

৪। প্রেমিক – সৌগত খাঁ

৫। সেই তুমি, নেই তুমি – বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। একদিন দেখা হবে – সাইমোঃউন মোরসেদ রিয়াদ

৭। সেই ট্রেডিশন – সুকান্ত লাহা

৮। জীবন, তুমি একটু চল ধীরে – গুলজার সাহেব

৯। দুগ্গা পুজো – শ্রেয়সী গুপ্ত

১০। অজেয় স্বপ্ন – দেশব্রত বিশ্বাস

১১। স্নিগ্ধ শারদ সুর – বিরূপাক্ষ রায়চৌধুরী

আলোকচিত্র

১। রঙের আড়ালে মা – দেবর্ষি দাস

২। বরণ – বাপি কুণ্ডু

৩। আগমনী – বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। দীপ জ্বেলে যাই – সম্প্রীতি সেন

৫। মা – উদিশা মাইতি

৬। অনন্য শিল্প – সুদিপ্তা ধর

৭। প্রস্তুতি – কিশোর দাস

৮। ঢাকের কাঠি পড়ল বলে – অমিত কুমার গোস্বামী

৯। কাশের দোলা – অমিত কুমার গোস্বামী

অঙ্কন

১।দুর্গতিনাশিনী - অহনা দে

বড়গল্প

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

– সমর্পিতা হালদার

(১)
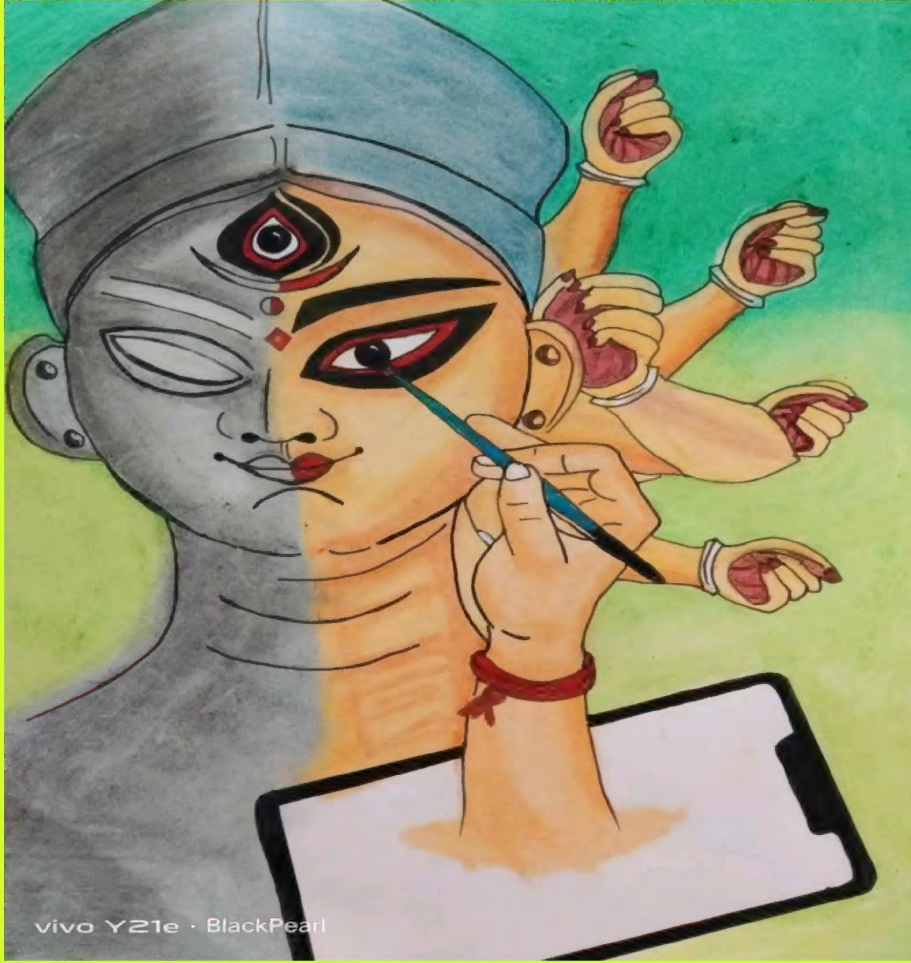
"লজ্জা করেনে তোমার? কেমন পুরুষ মানুষ তুমি, যে বচ্ছরকার দিনে নিজের ইস্তিরিকে একটা শাড়ি কিনে দেবার অব্দি মুরোদ নেই?" লতার মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না শ্যামল, নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের শ্যামল ঢাকী। বিয়ের পর থেকে কত অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই তো দিন কেটেছে তাদের। কই এর আগে কখনও তো একটা শাড়ির জন্য তাকে এমনভাবে কথা শোনায়নি লতা! হঠাৎ কী হলো তার? উনুনে ভাত বসিয়ে বঁটিতে শাক কাটতে কাটতে লতা আবার শুরু করে "পুজোকালের দিনে চেলেমেয়ে দুটোকে একটা করে নতুন জামা কিনে দিতে পাল্লামনে। একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে পারবোনে। মা হয়ে যে বুকটা ফেটে যায় আমার! তুমি আর কী বুজবে আমার জ্বালা! খাওয়াতে পরাতে পারবেনে যকন, বাপ হইচিলে কেন?"

এ অপমান আর সহ্য হচ্ছে না শ্যামলের। কানদুটো দিয়ে যেন তপ্ত লাভা বেরোচ্ছে তার। যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছে লতা! সে কী জানে না এবারে গাঙ্গুলী বাড়িতে ঢাকের বায়না পায়নি শ্যামল? তাই তো তাদের এই দুরবস্থা। শ্যামলের বাবার আমল থেকে প্রতিবছর পুজোয় গ্রামের পুরনো জমিদার গাঙ্গুলীদের বাড়িতে ঢাক বাজিয়ে আসছে তারাই। ছোট্টবেলায় বাবার হাত ধরে ও বাড়ির ঠাকুরদালানে গিয়ে দাঁড়াত শ্যামল। বাবা একমনে ঢাক বাজাতেন, আর শ্যামল নাচতে নাচতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। কে যেন ডাকত তাকে। সে কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ! মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাত শ্যামল। দেখত বাবার ঢাকের বোলে মৃণ্ময়ীতে কেমন একটু একটু করে জেগে উঠছে চিন্ময়ী মা। মায়ের চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে উঠত তখন। শ্যামল অপলকে তাকিয়ে থাকত সেদিকে। তারপর শ্যামল বড় হলো। ঢাক বাজাতে শুরু করলো বাবার সঙ্গে সেও। তারপর বাবাও একদিন চলে গেলেন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে, আর ও-বাড়ির বড় কর্তাও। ছোটকর্তার আমলেও শ্যামলেরই ডাক আসে প্রতিবার দুর্গাপুজোয় ও বাড়িতে ঢাক বাজাতে। কিন্তু এবারে হঠাৎ সেদিন ছোটকর্তা তাকে ডেকে বললেন "শ্যামল, খুব বড় করে পুজো করছি রে এবার। আমাদের ব্যবসার সব লোকজন আসছেন কলকাতা থেকে। তাই ওখান থেকেই বড় ঢাকীও আনছি এবারে। তুই বরং এবছরটা অন্য কোথাও দেখে নে।"

একটা কথাও বলতে পারেনি শ্যামল। গলার কাছটা টনটন করে উঠেছিল শুধু। শেষে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ফিরে এসেছিল বাসায়। এসে সব কথা জানিয়েছিল লতাকে। সেদিন তো লতা নিজের আঁচল দিয়ে ওর ঘর্মাক্ত মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলেছিল "এত চিন্তা কোচ্চো ক্যানে বলো দিকি? এবারে নয় অন্য কোতাও ঢাক বাজাবে! চোটোকাটো কিচু না কিচু একটা বায়না জুটেই যাবে কোতাও। নইলেই বা আর কী হবে? শ্যামলী ধবলীর দুদ হাটে বেচে সেই টাকায় সংসারটুকু চালিয়ে নিতে পারবো গো ঠিক। হয়তো নতুন জামাকাপড় হবেনে এবচর। সে একবার নয় নাই হলো। মনখারাপ কোরোনে গো তুমি। ওটো দিকি, চান করে কিচু মুকে দাও।" তাহলে আজ হঠাৎ কী হলো লতার? সে যাইহোক, একথা শোনার পর আর চুপ করে ঘরে বসে থাকা চলে না। গামছাটা কাঁধে তুলে নিতে নিতে শ্যামল বলে "বেশ। আমি বেরোলেম। আজ যদি তোর আর চেলেমেয়েদের পুজোর শাড়ি, জামাকাপড় আনতি পারি, তবেই ফিরব ঘরে, নইলি নয়।" হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে যায় শ্যামল।

(২)

শ্যামল চলে গেলে যেন সম্বিত ফিরে পায় লতা। এসব কী বলে ফেলল সে? শ্যামলই বা কী বলে চলে গেল? আট বছরের কুসুম মায়ের কোল ঘেঁষে বসে বলে "বাবাকে এত বকলে ক্যানে মা? নতুন জামা নয় নাই পরতেম পুজোয়! বাবা যে চলে গেল কষ্ট পেয়ে!" মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে লতা। মনে মনে ভাবে, সাধে কী আর কথাগুলো শুনিয়েছে সে শ্যামলকে? তার বুকের ভেতরটা যে পুড়ে যাচ্ছে সকাল থেকে, লজ্জায়, অপমানে।

সকালে উঠে লতা যখন ঝাঁটাটা হাতে নিয়ে উঠোনটা ঝাঁট দিচ্ছিল, ও পাড়ার বিশু মন্ডল হন্তদন্ত হয়ে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল কোথাও। ওকে একা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে "কী রে লতা, সকাল থেকেই কাজে লেগে পড়েছিস? অবশ্য কীই বা করবি? বসে খাবার কপাল কী তোর আছে? আর কপালেরই বা দোষ দিই কী করে বল? এত বড় মানী মানুষ হয়ে তোর রূপে ভুলে তোর বাপের কাছে মাথা নিচু করে গেলাম তোকে চাইতে। তা তুই কিনা ওই শ্যামল ঢাকীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে আমাকে এককথায় ফিরিয়ে দিলি! এখন বোঝ, কত ধানে কত চাল! আমার কাছে রাণী হয়ে থাকতে পারতিস। তা না করে ছেঁড়া শাড়ি পরে শ্যামলের উঠোন পরিষ্কার করছিস।"

লতা তৎক্ষণাৎ বুকের আঁচলটা আর একটু ভালো করে টেনে নেয় সামনের দিকে। হ্যাঁ, আঁচলের একটা পাশ একটু ছিঁড়েছে বটে; কিন্তু তাই বলে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না শাড়িটাকে! আজ দুপুরেই ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে ভালো করে সেলাই করে নিতে হবে ছেঁড়া জায়গাটাকে, মনে মনে ভাবে লতা। তারপর বিশু মন্ডলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে "আপনে নিজের কাজে যাচ্চেন, যাননে। আমাকে নিয়ে এত ভাবনা কীসের আপনের? আমি যা আচি, ভালো আচি।"

যেতে যেতে বিশু মন্ডল টিপ্পনী কেটে যায় "এবারে তো শুনলাম গাঙ্গুলী বাড়ির বায়নাটাও পায়নি শ্যামল। তা পুজোয় তোর নতুন একটা শাড়ি জুটবে তো? নাকি এই ছেঁড়া শাড়ি পরেই...সে যাইহোক, পুজোকালের দিনে ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকিস না। আমার কাছে চলে আসিস। আমার তো আবার দয়ার শরীর, কারও দুঃখ সইতে পারি না, তোর মতোন সুন্দরীর তো নয়ই। আমাকে একটু সময় দিস, একটু সেবা টেবা করিস। তারপর নতুন দামি শাড়ি নিয়ে নাহয় চলে আসিস আবার ঘরে!"

লতার আগুন ঝরানো দৃষ্টির সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পায়নি বিশু মন্ডল। ওর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে বিশুর। উফ্! যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা! এখুনি বধ করবে অসুরকে।

বিশু মন্ডল চলে গেলে পাশে রাখা বালতি ভর্তি জলটা উঠোনে উপুড় করে দিয়ে উঠোনের সব ময়লা সাফ করে দিতে দিতে লতা ভাবে, শ্যামল যদি কোনওভাবে একটা শাড়ি কিনে আনতে পারে তার জন্য, সেটা পরে ও ওই বিশু মন্ডলের চোখের সামনে দিয়ে ঠাকুর দেখতে যাবে।

তাই তো রাগের মাথায় শ্যামলকে বলে ফেলেছে কথাগুলো। এ যে তার মনের কথা নয়! শ্যামল কেন বুঝলো না তার মনটাকে?

(৩)

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হনহন করে হাঁটতে থাকে শ্যামল। যেদিকে খুশি চলে যাবে সে আজ। একবার ভাবে শহরে যাবে, মোট বইবে, লোকের বাগানে, বাড়িতে কাজ করে দেবে। টাকা সে জোগাড় করে আনবেই পুজোর আগে। পরক্ষণেই পথের ধারের কাশফুল গুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে যায়, পুজো যে এসে গেল! আজ তো চতুর্থী! মাঝে তো আর একটা মাত্র দিন। একদিনে কীভাবে জোগাড় হবে এত টাকা? সবার জন্য নতুন জামাকাপড় আনবে কীভাবে সে? মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ে শ্যামল। দেখতে পায় সামনেই গাঁয়ের দুর্গা মন্দির।উঠে দাঁড়ায় শ্যামল।

মায়ের সামনে এসে হাতজোড় করে বলে "পিতিবার জানতে চাই 'কবে আসবি মা?' এবার কইচি, কবে যাবি রে মা? তুই চলি গেলি বিজয়ার দিন আমার চেলেমেয়ে দুটো ওই বড় বাড়িতে পেন্নাম করতি গেলি ওরা ওদের মিঠাই দেবে। পুজোয় তো ভালো খাওয়াতি পাল্লামনে, ওইদিনই একটু ভালো খাবে! কী বলি বল? লতা বোজে না, যে বাপের পরাণও চেলেমেয়ের কষ্টে কাঁদে; কিন্তু মা, তুই তো বুজিস। তুই তো সব জানিস। রাগ করিসনে মা, তোরে আসার আগেই চলি যেতি কইলেম বলি!"

কাঁধের গামছায় চোখ মুছতে থাকে শ্যামল। হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। শ্যামল আশ্রয় নেয় ওই দুর্গা মন্দিরেই। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। ভাত বেড়ে বসে থাকে লতা। শ্যামল ফিরছে না দেখে চিন্তায় ছটফট করতে থাকে ভেতরে ভেতরে। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিজে একঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। বাকি ভাতটুকুতে জল ঢেলে রেখে দেয়।

ওদিকে বৃষ্টি থামারও নাম নেই। বাড়ি থেকে একটু বেরিয়ে যে শ্যামলকে খুঁজতে যাবে, সে উপায়ও নেই লতার। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে আসে; তবুও অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়তেই থাকে। গাঁয়ে যেন বান ডাকবে এবার আশ্বিন মাসে। সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। শ্যামল মন্দিরে বসে থাকে চুপচাপ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। বৃষ্টি হয়ে চলে রাতভর। পরেরদিন সকালেও

থামে না সে বৃষ্টি। সন্তানের কষ্টে দেবী-মায়েরও প্রাণ ভাসল বুঝি আজ। তাই বুঝি এই আকাশভাঙ্গা জলধারা অঝোরে ঝরে চলেছে মাটির বুকে।

(৪)

পরেরদিন দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরে এলে মাকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে শ্যামল। সারা রাতের নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখদুটোকে কোনওমতে খুলে রেখে উদ্ভ্রান্তের মতো হেঁটে চলে রাস্তায়। জানে না কোথায় যাবে সে আজ।

কলকাতা যাবার রাস্তার দিকে যেতে গিয়ে দেখে রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে। যানবাহন কিছুই চলছে না, রাস্তা বন্ধ। নিরুপায় হয়ে উল্টোদিকে মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে যায় গাঙ্গুলী বাড়ির ছোটকর্তার সঙ্গে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনিও খুব চিন্তিত। শ্যামলকে দেখে বললেন "ভাগ্যিস তোকে পেয়ে গেলাম এখানে! নাহলে এক্ষুনি তোর বাড়িতেই ছুটতে হতো।" শ্যামল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছোটকর্তার মুখের দিকে।

ছোটকর্তা বলেন "আরে এই বৃষ্টিতে দেখছিস তো পথঘাটের কী অবস্থা। আমার ব্যবসার লোকজনেরাও আসতে পারলেন না, আর ঢাকীও না। ওঁরা তাও পারলে অষ্টমী-নবমীতেও চেষ্টা করবেন বলেছেন আসার; কিন্তু ঢাকীর তো আর অষ্টমী-নবমীতে এলে চলে না! এখন তুইই পারিস আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এই নে, পুজোর বায়না দিয়ে গেলাম। বোধন থেকে বিসর্জনের ঢাক তোকেই বাজাতে হবে কিন্তু!" চোখের জল কোনওমতে লুকিয়ে ছোটকর্তাকে নিশ্চিন্ত করে বাড়ির পথে পা বাড়ায় শ্যামল।

(৫)

শ্যামলকে বাড়ি ঢুকতে দেখে কুসুম আর কমল দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বাবাকে। ওদের হাঁকডাকে লতাও বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে "সুদু আমার মুকের কতাটাই শুনলে? আমার বুকে যে কত জ্বালা...সেটি একবারও না বুজে বেরিয়ি চলি গেলে বাড়ি তেকে?" শ্যামল ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে জানতে পারে কাল থেকে কিচ্ছুটি খায়নি লতা। শ্যামলকে ভাত বেড়ে খেতে ডাকলে শ্যামল প্রথম গ্রাসটা তুলে দেয় তার মুখে। দুজনেরই চোখের জলে ভেসে যায় সব অভিমান। একসঙ্গে বসে পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকে শাক-ভাত, ঠিক যেন পরমান্ন!

(৬)

আসে ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। সবাই নতুন জামাকাপড় পরে গাঙ্গুলী বাড়িতে যায় মায়ের মুখ দেখতে। যাবার পথে লতা শ্যামলের কানে কানে বলে "বিশু মন্ডলের তেলের কলের সামনের রাস্তা দিয়ে চলোনে গো! তোমার দেওয়া নতুন শাড়ি পরে গব্ব করে হেঁটে যাবো আজ ওর চোকের সামনে দে।" মুচকি হেসে শ্যামল বলে "আমার বউটা সত্যি একটা পাগলী। না বাবা, ওকান দে গিয়ে কাজ নেই। আজ এমনিতেই এত সুন্দরী দেখাচ্ছে

তোরি, মনি হচ্চি সবার থেকি আড়াল করি রেকি দেই ঘরে। আবার যদি ওই বিশু মন্ডলের নজর পড়ি যায় তোর ওপর! সেবার অনেক কষ্টে ওর হাত থেকি বাঁচিয়ে নিজের কাচি নি আসতি পেরিচি তোরে। তোর বাপের হাতে পায়ে ধরি এক্কেরে। আর নয় বাবা! সুকের চাইতি আমার সোয়াস্তি ভালো!" কথাগুলো শেষ করে লতার চোখে চোখ রেখে হেসে ওঠে শ্যামল। মুখ বেঁকিয়ে রাগ দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলে লতাও।

(৭)

গাঙ্গুলী বাড়িতে শ্যামলের ঢাকে কাঠি পড়ে, শুরু হয় মায়ের বোধন। গিন্নিমা হাসিমুখে বলেন "আমার বাড়ির দুগ্গামা তুই ছাড়া আর কারোর ঢাকের আওয়াজে জাগবে না রে শ্যামল। তাই তো মা বৃষ্টিতে সব ভাসিয়ে দিয়ে কলকাতার ঢাকীর আসার পথ বন্ধ করে দিল। এ বাড়িতে যতদিন পুজো হবে, তোরাই ঢাক বাজাবি মায়ের সামনে।" গিন্নিমার কথায় চোখদুটো জলে ভরে আসে লতার। শ্যামলের চোখদুটোও ঝাপসা হয়ে আসে।

ঝাপসা চোখে মায়ের মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে শ্যামল। সেই ছোটবেলার মতো অনুভব করতে থাকে, ঢাকের শব্দে জেগে উঠছে মা। মায়ের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, যেন জীবন্ত এক মানবী। মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ী আবির্ভূতা হয়েছেন। শ্যামল ছলছল চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে "আমারে তুই ক্ষমা করিস রে মা। কবে যাবি জানতি চেইচিলাম তোর কাচি। তোর আগমনির আগেই বিসজ্জনের কতা ভেবিচি। সেকতা আমি ফিরিয়ে নিলেম মা।

তুই যাসনে মা, তুই যাসনে। এমনি করেই এই গাঁ আলো করে রয়ে যা মা চিরকাল। আমি দু'চোক ভরি দেকি তোরে।" মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসিটা যেন একটু বেশি ঝলমল করছে আজ। ধূপধুনোর ধোঁয়ার আড়ালে উদ্ভাসিত দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। সন্তানের দুর্গতি নাশ করে তিনি যে আজ প্রকৃত অর্থেই 'দুর্গতিনাশিনী'!

শশীবাবাবুর বাংলো

- শঙ্খ শুভ্র নায়ক

"মেয়েটা এগিয়ে এল আমার দিকে। গায়ে এক বিন্দু কাপড় ছিল না মেয়েটার। এগিয়ে এসে আমার কোলে চড়ে বসল। তারপর আমার গলা টিপতে লাগল। ভাগ্যিস আমার চিৎকার আমার চাকর রবি শুনতে পেয়েছিল, সেই এসে আমাকে ঘর থেকে বার করে, তাই আজকে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন," ভদ্রলোক হাপাতে হাপাতে বললেন।

আমি মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক বলে চললেন,"মেয়েটাকে আমি চিনি, ওর সঙ্গে এক সময় আমার কিছু সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমার কলেজেরই স্টুডেন্ট ছিল মেয়েটা। তখন আমার যৌবন কাল, দেখতেও বেশ হ্যান্ডসাম ছিলাম, তাই সম্পর্কের লোভ সামলাতে পারিনি। পরে যখন মেয়েটার ব্যাপারে ডিটেলে জানতে পারি, তখন খুব আফসোস হয়েছিল। মেয়েটার হার্টের প্রবলেম ছিল, চিকিৎসা তো তখন এতটা উন্নত ছিলনা, তাই মেয়েটা বেশিদিন বাঁচেনি। কলেজ পাস করে বার হওয়ার আগেই হার্ট ফেল করে মেয়েটা মারা যায়।"

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ভদ্রলোক থামলেন। ভদ্রলোকের নাম শশীভূষণ ভট্টাচার্য। ছিলেন কলকাতারই এক নাম করা কলেজের প্রোফেসর। সারাজীবন শহরে কাটিয়েছেন, ছেলে মেয়ে মানুষ করেছেন, তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য রাজ্যে। স্ত্রী গত হয়েছেন দু'বছর হল। এই একা মানুষটির শখ হয়েছে জীবনের শেষ কটা দিন কোনো অরণ্য সঙ্কুল জায়গায় কাটাবেন, আর সেজন্যই তিনি ঝাড়গ্রামের একটা জঙ্গলের পাশে পুরানো একখানা বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মাঝেমধ্যে গিয়ে ওখানে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসবেন। কিন্তু যাওয়ার তিনদিনের মাথাতেই ভয়ানক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রথমে ঝাড়গ্রাম হাস্পাতালে তারপর কলকাতার অ্যাপেলোতে রেফার হয়ে এলেন। আমিও একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এই হাস্পাতালেই ভর্তি হয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য(#অদল_বদল)। তাতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। বললাম, "বাড়ি কেনার আগে খোঁজ খবর নিয়ে কেনেননি?"

শশীবাবু বললেন, "খোঁজ তো নিয়েছিলাম। এর আগে তিনটা পরিবার ওই বাড়িতে থাকতে এসে মারা গেছে। তারপর থেকে বাড়িটা রিফিউজি ক্যাম্প ছাড়া আর কোনো কাজেই ব্যবহার হত না। কিন্তু ইদানীং এক কন্ট্রাক্টর বাড়িটাকে রিনোভেট করেছে, ভেবেছিলাম, তাতেই হয়তো পুরানো সব পাপ ধুয়ে গেছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমারও যে একই অবস্থা হবে ভাবতে পারিনি।"

বললাম, "আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

শশীবাবু বললেন, "বিশ্বাস না করার মতো তো কিছু নেই শঙখ বাবু। ভগবান যেমন আছেন তেমনি ভূতও আছে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার জন্যই তো শুভ শক্তির জন্ম হয়। সুতরাং শুভ শক্তির অস্তিত্বই অশুভ শক্তির প্রমাণকে প্রকট করে দেয়।"

বললাম, "আমি ভূতে বিশ্বাস করিনা। আমার মতে এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার কিছু না বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সব সময় সে কারণটা যে জেনারেল সায়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তা নয়। কেননা সায়েন্স এখোনো এতটাও অ্যাডভান্স হয়নি, যে সব কিছু ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে, সে জন্য আমি অনেক সময় থিওরিটিক্যাল সায়েন্স ইউজ করি। কিন্তু আমরা যা কিছু করি তা সায়েন্সের বেসিকেই..."

শশীবাবু বললেন, "তার মানে তুমি বলতে চাইছ ওই বাড়িতে ভূত প্রেত কিছুই নেই? যা কিছু দেখেছি সবই আমার কল্পনা?"

বললাম, "হয়তো কল্পনা হয়তো নয়। তবে এই ঘটনার পিছনে আমি কিছু লজিক খুঁজে পাচ্ছিনা। আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ড যে হয়তো কলকাতার বাসিন্দা ছিল, সে মরার এত বছর পরে ঝাড়গ্রামের একটা পুরানো বাড়িতে আপনার উপরে প্রতিশোধ কেন নিতে আসবে? প্রতিশোধ নেওয়ার হলে সে তো আগেই নিয়ে নিতে পারত। ওদের যেসব ক্ষমতা বিভিন্ন গল্পগাছায় পড়ি, তাতে আপনার একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট অথবা আপনার বাড়িতে একটা গ্যাস ব্লাস্ট করিয়ে দেওয়া ওদের কাছে নস্যি।"

শশীবাবু আমার কথায় রেগে গেলেন। বললেন, "আপনার যদি এতই অবিশ্বাস তো আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনি আমার ওই বাড়িতে গিয়ে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসুন। যদি পারেন আপনার ওই ভূতুড়ে সংস্থার এক বছরের সমস্ত ট্যুরের খরচ আমি দেব।"

বললাম, "আমাদের সংস্থা তো কারোর দয়ার উপরে নির্ভর করে চালাইনা। যতদিন আমাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, ততদিন আমরা বিভিন্ন অভিযান করে যাব। তারপর যদি মনেহয় আর টানতে পারছিনা, তখন ওসব বন্ধ করে দিয়ে অন্য কিছু করব। তবে আপনার চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম। এমনিতেও এই দুর্ঘটনার পরে আমাকে হাওয়া বদল করতে কোথাও না কোথাও যেতেই হত। জঙ্গলের পাশে একটা প্রাচীন বাড়িতে যদি বিনাপয়সায় দিন সাতেক থাকার সুযোগ পাই, মন্দ কি?"

হাস্পাতাল থেকে বেরিয়ে ভেবেইছিলাম আর নতুন করে কোনো ঝামেলায় জড়াব না। আমার নাক মুখ কানের যে অবস্থা হয়ে আছে, তাতে নিজেকে নিজের দেখে খারাপ লাগছে। এই অবস্থায় আবার কোনো ঝামেলায় পড়লে প্রাণটাই রক্ষা পাবে কিনা কে জানে? ঘোষ্টুতে এসে অভি আর সৌমর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি কিছুদিন হাওয়া বদল করতে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি। ফিরে এসে নতুন করে কোনো জায়গায় যাওয়া যায় কিনা ভাবব।"

অভি বলল, "বেড়াতে যেতে আপত্তির কিছু নেই, ঝামেলায় না জড়ালেই হল। তুমি তো সাধ করে ঝামেলায় জড়িয়েছিলে, তাই নাক কান খুইয়েছ। এবারে গিয়ে কোনো ঝামেলায় জড়িওনা আবার।"

বললাম, "ঝামেলা আমি সাথে করেই নিয়ে যাচ্ছি, যে বাড়িতে যাচ্ছি সেটা একটা ভূতুড়ে বাড়ি। যদি বিপদ আপদ হয় তোরা গিয়ে উদ্ধার করিস।"

সৌম বলল, "অভাব যায় না হলে, আর স্বভাব যায় না মলে! তুমি হচ্ছ সেই ক্যাটাগরির। যাও ঘুরে এসো, হাত পা গেলেও প্রাণটা যাতে বাঁচে সে খেয়াল রেখো, আর কিছু টের পেলে আমাদের ফোন করে দিও।"

বললাম, "ঠিক আছে..." দিন দুয়েক পরে এক দুপুরে আমি ঝাড়গ্রামে শশীবাবুর বাংলোতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। জঙ্গলের পাশে বাংলোটা বেশ ছিমছাম, দেখে মনেই হলনা এটা কোনো পুরানো বাড়ি ছিল। রিনোভেট করে এটাকে একদম নতুন চকচকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলোতে ঢোকার মুখে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। আন্দাজ করলাম এই রবি। আমার দিকে তাকিয়ে রবি বলল, "আপনি আসবেন বলে বাবু আমাকে জানিয়েছেন। বাবুর রুমেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করব তো?"

বললাম, "হ্যাঁ..."

রবির পিছনে পিছনে ব্যাগপত্র নিয়ে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। বাড়িটা দোতলা হলেও উপর তলাটা স্রেফ ডিজাইনের জন্যই বানানো, থাকার ব্যবস্থা রয়েছে নিচের তলাতেই। গোটা দুয়েক রুম সেই সঙ্গে ডাইনিং আর বাথরুম। কিচেনের জন্য ঘরের পাশে একটা অ্যাটাচড এরিয়া আছে। আমি শশীবাবুর রুমে ঢুকে জিনিস পত্র নামালাম। জিনিসপত্র সেরকম কিছুই আনিনি, স্রেফ কিছু জামা প্যান্ট আর একটা ইএমএফ মিটার। রবি বলল, "স্যার, স্নান সেরে নিন আমি আপনার খাবার লাগাচ্ছি।"

বললাম, "তুমি কি আগে থেকেই আমার জন্য খাবার বানিয়ে রেখেছ?"

রবি বলল, "হ্যাঁ, বাবু আমাকে বলেছেন আপনার যত্ন আত্তিতে যেন কোনো ত্রুটি রাখি। বাজারের টাকাও উনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বললাম, "তোমার বাবু তো খুব দরাজ মানুষ দেখছি। বাবুর এই অবস্থা কিভাবে হল? তুমি কিছু করতে পারলেনা?"

রবি বলল, "আমি বাবুকে অনেক বার এই বাড়ি কিনতে মানা করেছিলাম, এই বাড়িতে অভিশাপ আছে। কিন্তু বাবু শুনলেন না, নইলে কি আর এমন হত?"

বললাম, "ঠিক আছে, এই ব্যাপারে রাতে তোমার কাছে গল্প শুনব..."

খাওয়া দাওয়া সেরে আমি গোটা ঘরটা জরিপ করতে লাগলাম। ঘর, ঘরের বাইরে বারান্দা। একপাশে ডাইনিং রুম। ঘরের লাগোয়া কিচেন আর গেস্টরুম, ওখানেই রবি থাকে। তাছাড়া ঘরের পিছনে জঙ্গল। ঘরের আশেপাশে কিছু ঝোপঝাড়। আমি নানা জায়গা থেকে কিছু স্যাম্পেল কালেক্ট করলাম। তাছাড়া ইএমএফ মিটারেও টেস্টিং করলাম। এই জায়গাটাকে দেখে এখানে অন্য কোনো ডাইমেনশনের দরজা আছে বলে মনেহল না। একদম সিম্পল একটা জায়গা। এরকম মনোরম পরিবেশে এলে স্বাস্থ্য খুলে যাওয়ার কথা।

সেদিন বিকেলে আমি ঝাড়গ্রামে গিয়ে আমার কালেক্ট করা স্যাম্পেলগুলো ঘোষ্টুতে কুরিয়ার করে পাঠালাম। সৌমকে বললাম, এগুলো টেস্ট করে কি রিপোর্ট পাওয়া যায় আমাকে জানাতে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে আমি রবির সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলাম। রবিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি দুপুরে এই বাংলো নিয়ে কি বলবে বলছিলে?"

রবি বলল, "বাংলোটার অনেক বদনাম আছে স্যার। বাংলোটা যে জায়গায় তৈরি হয়েছিল সেখানে এক সময় ভাগাড় ছিল। এক সময় মড়কে পড়ে অনেক জীব জন্তু মারা গেছল সেগুলোকে এখানে পোঁতা হয়েছিল। শোনা যায় ইংরেজরা নাকি অনেক লোককে গুম খুন করে এখানে পুঁতেছিল। পরে এক ইংরেজ সাহেব এই জায়গাতেই নিজের বাংলো বানান। কিন্তু সেই সাহেব বেশিদিন বাঁচেননি। এক সময় আত্মহত্যা করেন। তারপর দুটো পরিবার এখানে থাকতে এসেছিল, কেউই বেশিদিন বাঁচেনি। একজন স্বামী স্ত্রী আর ছেলেকে তো একসঙ্গে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘুমের মধ্যেই তিনজন মারা গেছল। তবে পরেরটা পৈশাচিক। এক বিদেশি কাপল এখানে এসে কিছুদিন ছিল। কিছুদিন পরে এখানে তাদের ডেডবডি পাওয়া যায়। দু'জনে একে অপরের গলা টিপে খুন করেছিল। এরপর বহু বছর এখানে কেউ থাকতে আসেনি। কিছু বছর আগে রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় এই বাড়িটাকে টুকিটাকি সারিয়ে যে সব লোকের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তবে সেসময় আর কিছু ঘটেনি। তারপর ইদানীং একজন কন্ট্রাক্টর বাড়িটার দখল নিয়ে রিনোভেট করেছে।"

বললাম, "বুঝেছি। আচ্ছা, একটা জিনিস জানতে চাইছি। বাড়ির মেঝেতে একটা ফাটল দেখলাম, রিনোভেট করার পরেও ওরকম ফাটল হল কিভাবে?"

রবি বলল, "ওটা আগে ছিলনা। দিন কয়েক আগে একটা ভূমিকম্পের জন্য হয়েছে।"

বললাম, "আচ্ছা..."

রবি বলল, "স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব?"

বললাম, "হ্যাঁ, বলো...."

রবি বলল, "আপনার সারা মুখে এতগুলো সেলাই কিসের জন্য? কোনো এক্সিডেন্ট হয়েছিল?"

বললাম, "হ্যাঁ, ভূত ধরতে গিয়ে..."

অবাক গলায় রবি বলল, "আপনি ভূত ধরেন?"

বললাম, "হ্যাঁ, ওই আর কি!"

রবি বলল, "ভূতটা কি আপনাকে আক্রমণ করেছিল?"

বললাম, "ওই রকমই বলতে পারো।"

আমার ভাসাভাসা জবাবে রবি খুব একটা সন্তুষ্ট হল বলে মনেহল না। বলল, "সাবধানে থাকবেন স্যার। তেনাদের পিছনে লাগতে যাওয়া খুব একটা সুবিধার বলে মনেহয়না।"

রবি চলে যাওয়ার পরে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারারাত খুব নিশ্চিন্তেই ঘুমোলাম। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই শরীরটা খুব দুর্বল লাগতে লাগল। এখানের আবহাওয়ায় আমার চাঙ্গা হয়ে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু মনেহল আমার শরীরটা যেন ক্রমশ রিভার্সে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে ধকলের দরুন ক্লান্তি ভেবে অগ্রাহ্য করলাম। পরদিন আমি ঝাড়গ্রামের কিছু টুকিটাকি জায়গায় ঘুরতে গেলাম। নতুন জায়গায় এসেছি, যদি ঘুরতেই না গেলাম তো কি করলাম?

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধেতে ফিরে এসে রাতে রবির বানানো খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন কত রাত জানিনা একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই মনেহল আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। যেন এক ক্রুদ্ধ আক্রোশে আমাকে তাকিয়ে দেখছে। আমাকে হুমকি দিচ্ছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বিছানা হাতড়ে মোবাইলটা পেতেই টর্চ জ্বালালাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। চারপাশটা ভাল করে চেক করে নিয়ে আমি বিছানা থেকে নামলাম। ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক জল খেলাম। বিছানায় ফিরে আসতে যাব, হঠাৎ মনেহল আমার রুমে কিছু একটা আছে, একটা কিছু অস্তিত্ব যেটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু আছে। আমি ড্রয়ার খুলে ইএমএফ মিটার বার করলাম। চেক করে দেখলাম ইএমএফ মিটারের কাঁটায় কোনো হেলদোল হয় কিনা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম উল্টোপাল্টা গল্প শুনে আমার মতিভ্রম হয়েছে। আমি রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় হাটাহাটি করলাম, রুমে ফিরে আর কোনো কিছুকেই অস্বাভাবিক লাগল না। বুঝলাম, সম্ভবত উল্টো পাল্টা গল্প শোনার ফলে আমার মনের ভিতরে এফেক্ট ফেলছিল। তাই ওইসব জিনিস দেখছিলাম। আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই রাতে খুব ভাল ঘুম হল। কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার শরীরটা দুর্বল লাগতে শুরু করল। দুর্বলতা যেন কালকের চেয়েও বেশি। আমার একটু সন্দেহ হতে লাগল। আমি সৌমকে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম যেসব জিনিস পাঠিয়েছি সেগুলোর টেস্টিং হয়েছে কিনা। সৌম বলল, "দু'তিনটা জিনিসের টেস্টিং হয়ে গেছে। খাবারে কিছু মেশানো হয়নি, জলও নর্মাল, আশেপাশের যেসব গাছপালা আর ফুলের স্যাম্পেল পাঠিয়েছিলে সেগুলোও বিষাক্ত কিছু নয়। তবে বাকিগুলোর টেস্টিং হতে আরও দু'একদিন টাইম লাগবে। কেন তুমি কি অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছ?"

বললাম, "শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে। তবে এটা স্বাভাবিকও হতে পারে। এত বড় এক্সিডেন্ট ঘটেছিল কিছুদিন আগে, তারপর এই ধরনের এফেক্ট ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।"

সৌম বলল, "রিস্ক নিয়ে কাজ নেই শঙখ দা, বাড়ি চলে এসো। এই শরীরে আর রিস্ক নিতে যেওনা।"

বললাম, "সেরকম রিস্কের কিছু আছে বলে তো মনেহচ্ছেনা। আর তুই তো বললি সব কিছু নর্মালই আছে। এটা হয়তো আমার মনেরই দুর্বলতা।"

সেদিনটাও ঘোরাঘুরি করেই কেটে গেল। তবে সেই রাতটা খুব একটা সুখের ছিলনা। সেদিন খাওয়া করে শোবার পরে আমার ঘুম আসছিল না সহজে। হঠাৎ মাঝরাতে একটা অস্বাভাবিক আর্তনাদ শুনতে পেলাম। মনেহল কেউ যেন ভয়ানক চিৎকার করে আমার সাহায্য চাইছে। আমি হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর বেরোতেই প্রায় একটা বিশাল কিছু জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছিলাম। ধাতস্থ হতেই বুঝলাম সেটা একটা হাতি। সামনে তাকিয়ে দেখলাম রবি মাটিতে পড়ে আছে, আর একটা হাতি ওর সামনে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে। ওকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারতে চাইছে। কোনো ভাবে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে রবি। আমি উপায়ান্তর না দেখে রবিকে বাঁচাতে নিজের দিকে হাতির মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। জোরে জোরে চিৎকার করতে আর দরজায় দুমদুম থাপ্পড় মারতে লাগলাম। এতে কাজ হল। রবিকে ছেড়ে হাতিটা আমার দিকে ঘুরল, আর ওই টুকু সুযোগ পেতেই রবি নিজেকে ঘসটে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমিও ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। বেশ

কিছুক্ষণ পরে যখন মনেহল হাতিটা চলে গেছে, তখন আমি দরজা খুলে আশেপাশে উঁকি মেরে রবির কাছে গেলাম। দেখলাম, বিছানায় শুয়ে রবি কাতরাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "রবি কি হল?"

রবি বলল, "স্যার, রাতে বাইরে বেরিয়ে ছিলাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে, কিন্তু সেই ডাক যে কোনো মায়াবীর হবে বুঝতে পারিনি। বাথরুম সেরে সবে দরজার কাছে পৌঁছেছি হঠাৎ হাতিটা এসে পিছন থেকে ধাক্কা মারল। একপাশে ছিটকে পড়লাম। মনেহচ্ছে একটা পা ভেঙে গেছে।"

দেখলাম, মোটেই ভুল কিছু বলছেনা রবি। রবির একটা পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা না করলে বিপদ হয়ে যেতে পারে। রবির কাছে স্থানীয় ড্রাইভারের ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করে রাতেই আমি রবিকে হাস্পাতালে ভর্তি করলাম। পরের দিনটা গেল রবির এক্সরে করাতে আর তারপর প্লাস্টার করাতে। রবিকে হাস্পাতালে রেখে আমি যখন রুমে ফিরলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ভেবেই নিয়েছিলাম, এই অলুক্ষুণে জায়গায় আর বেশিদিন নয়। কাল সকাল হলেই চলে যাব। বাসটাস থাকলে রাতেই চলে যেতাম। হোটেলেই খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিলাম। সারাদিনের ছুটা দৌড়ায় ফোনটাও সুইচ অফ হয়ে গেছে। কাউকে যে কোনো খবর দেব সে উপায়ও নেই। রাতের দিকে ফোনটাকে চার্জে বসিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। সেই রাতে শুয়ে শুয়ে নানা রকম চিন্তা ভাবনায় আমার ঘুম আসছিলনা। এখানে আসার পরে তিনদিন কেটে গেছে, অথচ যা সব একের পর ঘটে যাচ্ছে, তার একটার পিছনেও লজিক খুঁজে পাচ্ছিনা। হাস্পাতালে ভর্তি থাকার সময় এক ভদ্রলোক আমাকে খুব জোর গলায় বলেছিলেন, "সব কিছুর পিছনে সায়েন্স খুঁজতে যেওনা শঙখ, এই পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু তো আছেই, তুমিও একদিন সেটা টের পাবে।"

এখন মনেহচ্ছে ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে একটা তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। ঘুম ভাঙল বনবন একটা শব্দে। চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম আমি শিলিং এর কাছে লটকে আছি। কিছু একটা শক্তি আমাকে বিছানা সমেত উপরে তুলে ফেলেছে। আমার নাকের ডোগায়

ঘুরছে সিলিং ফ্যান। উঠে বসারও সুযোগ নেই। বসতে গেলেই ফ্যানের ব্লেডে গলাটা ক্যাঁচ করে কাটা হয়ে যাবে। আমি বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। আমার নড়াচড়া টেরপেতেই বস্তুটা আমাকে সুদ্ধ বিছানাটাকে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে ফেলল। আমি বিছানায় ড্রপ খেয়ে আরও কয়েক ফুট উপরে উঠে আবার বিছানায় এসে পড়লাম। বাইরে হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনেহচ্ছে যেন ঝড় হচ্ছে। এই অন্ধকার দুর্যোগের রাতে এক নিরালা অরণ্যের পাশে একটা জনশূন্য বাংলোর ভিতরে আমি কোনো অশুভ শক্তির সঙ্গে বন্দী হয়ে আছি, এটা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বিছানা থেকে টলতে টলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর সাথে সাথেই অন্ধকারে একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম দেওয়ালের কোনে। মনেহল মেরুদন্ডে খুব জোর আঘাত লেগেছে। ব্যথায় আমি কঁকিয়ে উঠলাম। অন্ধকারের মধ্যেই বোঝার চেষ্টা করলাম জিনিসটা কি। পরিস্কার কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে দুটো লাল চোখ জ্বলজ্বল করছে।

আমি হাঁতড়ে হাঁতড়ে আমার মোবাইলটা খোজার চেষ্টা করলাম। একবার টর্চ জ্বালিয়ে যদি বস্তুটাকে দেখতে পাই তো জিনিসটার সঙ্গে লড়াইয়ের শেষ চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু বেশিক্ষণ হাতড়াতে পারলাম না। তার আগেই জিনিসটা আমার কাছে এগিয়ে এল, তারপর আমাকে তুলে দড়াম করে একটা টেবিলের উপরে আছাড় মারল। আমার বুকের পাঁজরের কয়েক খানা হাড় ঝুরঝুর করে খসে পড়ল বলে মনেহল। তখনই মনে পড়ল এই টেবিলেই তো মোবাইলটা চার্জে বসিয়েছিলাম। আমি একটু খুঁজতেই মোবাইলটা পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার বোতামটা টিপে ধরে রাখলাম। জিনিসটা আবার আমাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমার মোবাইলের আলো জ্বলে উঠল। এবং সেই আলোয় জিনিসটাকে যা দেখলাম, তাতে এটাকে আমার যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়ের অনুভূতি তৈরি হল। আমাকে শূন্যে তুলে রেখেছে একটা ভয়ানক আধা জন্তু, আধা মানুষ। একে আমি চিনি, কিছুদিন আগে এরকম একটা জন্তুর শরীরেই আমার এক্স গার্লফ্রেন্ডের ব্রেন ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল। ওকে বাঁচাতে ওকে নিজের ডাইমেনশনে ফেরত পাঠাতে হয়েছিল। তবে কি সেই আবার ফিরে এসেছে? আমি চিৎকার করে বললাম, "শ্রীপর্ণা, এটা কি তুমি শ্রীপর্ণা?"

জন্তুটা আমার কথা শুনল বলে মনেহল না। আমাকে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। দু'খানা লাল চোখ নামিয়ে আনল আমার মুখের কাছে, তারপর তার লোমশ, নখর হাত দিয়ে আমার গলা টিপতে লাগল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মনেহল এখানেই হয়তো আমার জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা হল। আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম, কে যেন আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, সেই সঙ্গে আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি আমার সমস্ত শক্তিকে জড়ো করে চিৎকার করে উঠলাম, "বাঁচাও...." সাথেসাথেই আমি জ্ঞান হারালাম।

পরদিন আমার জ্ঞান ফিরল ঝাড়গ্রাম হাস্পাতালে। রবির পাশের বেডেই আমি শুয়ে আছি। আমার পাশে বসে আছে অভি আর সৌম। আমার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। অভির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার কি হয়েছিল? তোরা কিভাবে আমাকে উদ্ধার করলি?"

অভি বলল, "হয়েছিল আর কি! তুমি মরতে বসেছিলে। আমরা ঠিক সময়ে না এলে তুমি নিজেই নিজের গলা টিপে মারা যেতে।"

বললাম, "মানে? আমাকে ডিটেলে বল সব কিছু?"

সৌম বলল, "কাল যখন তোমার কাছে খবর পেলাম হাতির হানায় রবি হাস্পাতালে ভর্তি হয়েছে, তখনই আমরা ঝাড়গ্রাম আসব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি বললে, তুমি পরদিনই ফিরে আসছ, তাই আমরা প্ল্যানটা ক্যানসিল করি। বিকেলের দিকে তোমার পাঠানো স্যাম্পেলগুলোর লাস্ট রিপোর্ট আসে। তুমি মাটির যে স্যাম্পেল পাঠিয়েছিলে ওতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তখনই আমার মনেপড়ে যায়, তুমি বলেছিলে এই এলাকায় একসময় ভাগাড় ছিল। হয়তো পশুপ্রাণীকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল, কোনোভাবে সেগুলো থেকেই বিষাক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন হয়ে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে। আর তুমি তো জানো দীর্ঘসময় ধরে প্রাকৃতিক গ্যাস ইনহেল করলে হ্যালুসিনেশন থেকে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু সবই হতে পারে। সম্ভবত আগের মৃত্যুগুলো ওভাবেই ঘটেছিল। আমি সন্ধ্যেতেই তোমাকে ফোন করে খবরটা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার ফোন সুইচ অফ পাই। বুঝতে পারি তুমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো বিপদের মধ্যে আছো। তাই সময় নষ্ট না করে আমরা তক্ষুণি গাড়ি

নিয়ে ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ি। এখানে এসে তোমাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে দেরি হয়না, কি হয়েছে। হঠকারিতা ভাল, কিন্তু সব সময় সব জায়গায় হঠকারিতা দেখাতে যাওয়া ঠিক নয়।"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "ঠিকই বলেছিস। অনেক হয়েছে ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা। গতবারে তবু মুখ, নাখ, কান গেলেও প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু এবারে তো প্রাণটাই যেতে বসেছিল। এখন আমি ক'দিন আর কোনো ঝামেলায় জড়াব না। বাড়িতে বসেই রেস্ট নেব ।

রিকশার রিস্ক

- পার্থসারথি দাস

প্ল্যানটা মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই করা ছিল। পরীক্ষাটা শেষ হতেই যা অপেক্ষা। মাধ্যমিক বলে কথা। জীবনে এটার গুরুত্ব তাই অনেকটা গুরুতর। তাই এমন একটি পরীক্ষার অবসানও যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ওদের কাছে। ওদের বলতে অর্ক, বিলটু, বিশু ও টুকাই এর কাছে। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে যা বোঝায় এরা তার থেকেও একটু বেশি বোধহয়। স্কুলের ক্লাসে, পড়ার টিউশনে এমনকি খেলার মাঠেও তার উদাহরণ সবারই চোখে পড়ে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম সেই প্ল্যান এর কথা। বিলটুই প্রথম তুলেছিল কথাটা। বনভোজন। পরীক্ষার শেষের ঠিক পরের দিন। অর্কদের বাড়ির পিছনে যে বাগানটা আছে সেখানেই হবে। পরীক্ষা শেষ। তাই বাধাও নেই। তাই সেদিক থেকে ওরা ঝাড়া হাত পা। ঠিক হোল সন্ধের একটু আগে থেকেই ওরা জড়ো হবে অর্কদের বাড়িতে। সরঞ্জাম যা লাগবে তা ওখানেই ম্যানেজ হবে। বাকি রইল শুধু রান্নার দায়িত্ব। রাঁধার ব্যাপারে তো কারোরই তেমন অভ্যেস নেই। কি আর করা। অনেক বলেকয়ে টুকাই এর কাকুকে হাত করা গেল। কাকুর রান্নার হাতটি বেশ সরেস।'জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে কিন্তু, কি বলিস?'- বলল বিশু। 'তা যা বলেছিস পরীক্ষার জন্যে বাড়ির লোকে রোগীর পথ্য খাওয়ায় মাইরি। এটা না, ওটা না। কোনও মসালাদার খাবার নো এল্যাউ। শরীর নাকি খারাপ হবে। বিলটুর এই কথায় সবাই হেসে উঠল। এই বিলটু তোর সাউন্ডবক্স গুলো আনিস তো ওদিন। বেশ মজা হবে কিন্তু। বিশুর আর্জিতে সবাই সায় দিল। “ঠিকই তো একটু গানটান শুনলে মনটা বেশ ফ্রেশ হবে। কি বল?' অর্ক বলে উঠল।

সেদিন বিকেল থেকেই ওরা জুটে গেল অর্কদের বাড়িতে। ব্যবস্থা বেশ ভালোই। একটা ত্রিপল মাটিতে পেতে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত সবাই। স্পিকারে গান বাজছে। পরীক্ষার চাপের পর সবাই বেশ টেনশন মুক্ত। আনন্দে মসগুল সবাই। টুকাই এর কাকু একদিকে রান্না করছেন। রান্নার জোগাড় করে দিয়ে ওরা গল্পতে মত্ত। রান্নার সুবাসে চারিদিক মম করছে। গ্যাসলাইটের আলোয় বাগান বাড়িটা ভরে গেছে। বড় বড় গাছগুলোর ছায়া বড়ো অদ্ভুত লাগছিল। তারি মাঝে ওরা চার বন্ধু মিলে বনভোজনে মত্ত।

কিন্তু তাল কাটল একটু পরেই। রান্না প্রায় শেষের দিকে। আকাশে হঠাৎ মেঘের আনাগোনা দেখা গেল। সারা দিনের ভ্যাপসা গরমের অসস্তি ছিল। সন্ধের এই মেঘটা তারই ফল। এরই মধ্যে সারা আকাশ কালো হয়ে এল। দমকা বাতাসে ধুলোর ঝড়ে ঢেকে গেল চারদিক। ওরে পাততাড়ি গোটা সব, এখানে আর নয়'- চেঁচিয়ে উঠল বিশু ও টুকাই। গড়িমড়ি করে সব সরঞ্জাম নিয়ে দৌড়ল সবাই বাড়ির দিকে। এরই মাঝে হোঁচট খেল বিলটু। ত্রিপল গুটিয়ে বাড়িতে ঢুকল সবাই। ততক্ষনে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

উঃ বাঁচা গেল। বৃষ্টির আর আসার সময় নেই রে, দেখে দেখে আমাদের এই দিনটাতে আসতে

হোল? অর্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কী আর করবি বল? সবই প্রকৃতির খেয়াল। তবে রান্নাটা শেষ হয়েছে এই ঢের। এই এবার কিন্তু খেতে বসতে হবে। টুকাই এর কাকু বলে উঠল। 'হ্যাঁ কাকু আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খাবো' সবাই সমস্বরে বলে উঠল। হ্যাঁ বিশুকে আবার ফিরতে হবে অতটা।

আসলে অর্কদের বাড়ি থেকে বিশুর বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। মাইলদুয়েক তো হবেই। বাকি দুজনের বাড়ি কাছাকাছি। কয়েকটা বাড়ির পর। বাইরে বৃষ্টিটা বেড়েছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। এদিকে লোডশেডিং চলছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে মাঝে মাঝে ভরে যাচ্ছে ঘরটা। না আর দেরি করা চলে না। খেতে বসল ওরা সবাই।

বেগুনভাজা, আলুপোস্ত, ডাল, খাসির মাংস, চাটনি, দই আর মিষ্টি। মেনুটা বেশ জম্পেশ হয়েছে। * মাংসটা যা হয়েছে না কি বলব। বলল বিশু। তা যা বলেছিস। বাকিগুলোই বা বাদ দিই কি করে বল? কাকুর হাতটা না, একদম অমৃত" । বলে উঠল বিলটু। খাওয়াদাওয়া প্রায় শেষের পথে। বাইরে বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। লম্বা একটা ঢেকুর তুলে অর্ক বলল – "বিশু এই ঝড়জলের রাতে তোর আজকে বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, তুই বরং আজ রাতটা এখানে থেকে যা'। আমি কাকুকে একটা ফোন করে বলে দিচ্ছি।

`নারে একদমই থাকা যাবে না। খুব মুশকিল হবে তাহলে। বাবা এমনিতে আসতে বারন করছিল।কাল ভোরের ট্রেনে মাসিবাড়ি যেতে হবে'।

'কিন্তু এই দুর্যোগে তুই ফিরবি কিভাবে? গাড়ি তো পাবি না, এতোটা পথ হেঁটে যাবি নাকি'? আরে বেরোলে গাড়ি না পাই রিকশা তো একটা মিলবে নাকি। বৃষ্টিটাও প্রায় থেমে এসছে। ও নিয়ে চিন্তা করিসনা। বাড়ি আমাকে ফিরতেই হবে।

"তা বাবা বিশু তুমি যদি বাড়ি যাবেই বলছ, তাহলে আর দেরি করা ঠিক নয়। বেরিয়ে পড়।'

টুকাই এর কাকু বলল। অর্ক একটা ছাতা দিল বিশুকে।

বাড়ির বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল বিশু। হাতের ঘড়িটায় নটা বাজে। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি রাস্তার অন্ধকারকে খানখান করে দিচ্ছে। জনমানব শূন্য রাস্তাটা খাঁখাঁ করছে। নাহ কোন গাড়ি বা রিকশা তো চোখে পড়ছে না। এমনিতে অর্কদের বাড়ির এইদিকটাতে গাড়ি একটু কম চলাচল করে। তার উপর আজকের এই দুর্যোগ। গাড়ির দেখা না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। দেখা যাক বরাতে কি আছে। অপেক্ষা করতে লাগল বিশু। ছাতাটা আছে বটে কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপুনি দিচ্ছে সারা গায়ে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ছাতাটা উলটে যাওয়ার জোগাড় হল। 'আরে বিশুবাবু নাকি? তা এই ঝড়বৃষ্টির রাতে এখানে কি মনে করে? চলো চলো, বাড়ি ফিরবে তো মনে হয়। উঠে এসো রিকশাতে।

আরে এ যে হারুদা। হারুদার রিকশা। কই এতক্ষণ তো ঠাওর করতে পারেনি সে। দুর্যোগের সে রাতে হাতে চাঁদ পেল বিশু।

"তুমি এখন এখানে? কোথা থেকে আসছ? রিকশাতে উঠে জিজ্ঞেস করে বিশু। হারুর মুখটা চাদরে ঢাকা। ঠিক ঠাওর হচ্ছে না বিশুর। তবে ঠিকই চিনেছে সে। তাদের পাড়ার হারুদা। রিকশা চালায়।

তবে ওর সঙ্গে চেনাজানাটা অনেক দিনের। নার্সারিতে পড়ার সময় কতবার আসাযাওয়া করেছে ওর রিকশায়। বাড়ি ফেরার দুর্ভাবনাটা মাথা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল বিশুর। টুংটুং করে ঘন্টা বাজিয়ে রিকশা চলতে শুরু করে। আঃ বাঁচা গেল। যাইহোকে কোথা থেকে এলে বলো?

'আরে বিশুবাবু আর বল কেন? ইষ্টিশান থেকে শেষ ট্রেনের প্যাসেনজার নিয়ে ফিরছিলাম। তা পড়লাম এই ঝড়জলের মুখে। বৃষ্টি একটু থামতে ওখান থেকে বেরুলাম। আর এখানে রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা। তা আমি ভাবলুম অন্য কেউ হবে।প্যাডেলের গতিটা বাড়িয়ে দিয়েছে হারু। রিকশাটা যেন হাওয়ায় উড়ছে। ও হারুদা একটু আস্তে চালাও। যা গর্ত রাস্তায়। পড়লেই হয়েছে আর কি!' বলে ফেলে বিশু

আরে বিশুবাবু ডরো মত। ত্রিশ বছর রিকশা চালাচ্ছি। আর এটা তো রিকশা নয় গো। এ হল আমার পক্ষীরাজ। তুমি কোন চিন্তা কর না। ঠিক পৌঁছে যাবে।

রিকশায় বসে হারুদাকে লক্ষ করছিল বিশু। এ কি চেহারা হয়েছে হারুদার? এত রোগা এর আগে দেখেনি সে হারুদাকে। গায়ের চাদরটা যেন একটা সরু কাঠে জড়ানো। মাধ্যমিকের জন্যে খুব একটা বাইরে বেরনো হয়নি। হারুদার চেহারাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না বিশুর। এরই মধ্যে কখন যেন বাড়ির সামনে এসে গেছে রিকশাটা।

'নাও বিশুবাবু, নেমে পড়ো। বাড়ি এসে গেছে। হারুর ডাকে সম্বিত ফেরে বিশুর। সত্যিই তো, কখন যে সে বাড়ি চলে এসছে হুঁশই নেই। নাহ রিকশাটা বড্ড বেশি জোরেই চালিয়েছে হারুদা। এই ভেবে নেমে পড়ে সে। পকেট হাতড়ে ভাড়ার টাকা বের করতে গেলে হারু বলে উঠে –'ও তুমি রেখে দাও বিশুবাবু, ভাড়া লাগবে না। এমনিই তো ফিরছিলাম। তোমাকে না হয় নিয়ে এলাম। আর যদি দিতেই হয় কাল বাড়ি গিয়ে আমার বৌকে দিয়ে এসো'। এই বলে হারু রিকশাটা নিয়ে ঝড়ের বেগে রাস্তায় উধাও হল।

বাড়িতে ঢুকল বিশু। শরীরটা ক্লান্ত লাগছে। মা'র কাছে এক গ্লাস জল চাইল। গলাটা শুকনো কাঠ হয়ে গেছে। তারপর বিছানায় এলিয়ে দিল শরীরটা। সকালে আবার অনেকটা পথ জার্নি আছে। অবসন্ন দেহটা ঘুমে ঢলে পড়ল।

অনেকক্ষণে ভোর হয়েছে। সকালের রোদ জানলা গলে ঘরে পড়েছে। ঘুম ভাঙল বিশুর। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল সে। শরীরটা বেশ তাজা লাগছে। কাল রাতের ভাড়ার কাখাটা বেমালুম ভুলে গেল সে। মাসির বাড়ি যেতে হবে। মা তাড়া দিচ্ছে। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরল ওরা তিনজন। বিশু আর ওর বাবা মা। লাগেজ টা বেশ ভারি হয়েছে। ষ্টেশন যেতে একটা রিকশা ডাকা দরকার। রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল ওর বাবা।

রিকশা স্ট্যান্ডে একটা জটলা। কিছু ঝামেলা হয়েছে বোধহয়। বিশুর চোখ এবার হারুদাকে খুঁজছে। "কি হয়েছে রে মদন?' বাবা হাঁক পাড়লেন একটা রিকশাওয়ালাকে। কোন গণ্ডগোল নাকি? এত ভিড় কিসের?

লাগো দাদা, কাল রাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির রাতে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ভাড়ায় গিয়েছিল হারু। প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দিয়ে বড়ো রাস্তায় ওঠার সময়ই একটা ট্রাক ওকে পিষে দিয়ে চলে যায়। একদম স্পট ডেড। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি বোধহয় বেচারি। সকালে আমরা ওখান থেকে ওর তেবড়ানো

রিকশাটা নিয়ে এলাম। পুলিশ এসে ডেডবডিটা নিয়ে গেছে। তা আপনারা বোধকরি ইস্টেশন যাবেন। বলেন তো, ছেড়ে দিয়ে আসি। একটু পরে আমাদের আবার রাস্তা অবরোধ শুরু হবে।

দরদর করে ঘামতে থাকে বিশু। পা টা টলতে থাকে। একটা ঠাণ্ডা বরফের হিমশীতল স্রোত ওর শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে থাকে। গায়ের সমস্ত রোম নিমেষে খাড়া হয়ে ওঠে। কি শুনছে এসব সে? কাল রাতে তাহলে...? আর ভাবতে পারছে না বিশু। মাথার ভিতর সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কাল তবে কার রিকশায় এল সে? কে ছিল ওই চাদরমোড়া লোকটা? অসম্ভব। মাথা ঘুরতে থাকে ওর। আর পারছে না বিশু।

এই এই বিশু? কি হোল তোর? এমন ঘামছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে? বাবা মা ওকে তাড়াতাড়ি করে ঘরে নিয়ে এলেন। শুইয়ে দিলেন বিছানায়। মা এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন। খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হল সে। শুয়ে আছে বিশু। ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না কাল রাতের কথা। কি বীভৎস। প্রানপণে ভোলার চেষ্টা করছে সে সমস্তকিছু। কালকেই ভাড়ার টাকাটা সে দিয়ে আসবে। হারুদার বৌকে।

আমি চিনি গো তোমায় চিনি

- রুদ্র দেব বর্মণ

প্রথম অধ্যায়

মৃন্ময়ী ,

মৃন্ময়ী নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছিলো। আসলে কাঁদছিল ও। জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর দুচোখ। যতীন অবশ্য সেটা খেয়ালও করলো না। কোন দিনই বা করেছে। বিয়ের অনেকদিন পরেও একটা সময় পর্যন্ত মৃন্ময়ী আশা রেখেছিল হয়তো একদিন যতীন পাল্টে যাবে। কিন্তু কোথায় কী! ঐ যে বলে না যার ন' য়ে হয়না তার নব্বুইতেও হয় না! এই বোধটা আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী বরং নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। রোজকার কষ্টের পরিমাণ যাতে কম হয়। কান্নাকাটি, অভিমান, এসবের থেকে অনেক দূরেই এতদিনে চলে এসেছিল। যদিও আজকের ব্যাপারটা একটু আলাদা। তাই বিকেল থেকেই ও যতীনকে বোঝাবার চেষ্টা করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত চেষ্টাই অর্থহীন গিয়েছে। তাই এখন আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। যতীন কিন্তু তাতেও এখনও পর্যন্ত নির্বিকার। এদিকে মৃন্ময়ীর চোখ মুখ কাঁদতে কাঁদতে ইতিমধ্যে লাল হয়ে গিয়েছে। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছে মুখ তুলে মৃন্ময়ী যতীনের দিকে তাকায়। চোখে মুখে ভয় রাগ আর হতাশা মিলেমিশে এখন একাকার হয়ে রয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে শেষ পর্যন্ত এবার বলেই ফেলে, "তুমি, তুমি ... একটা জঘন্য লোক।"

যতীন দত্ত শুনতে পেল কিনা সেটা তার হাবভাবে ঠিক বোঝা গেল না। যেমন কাজ করছিল তেমনি নির্বিকারভাবে নিজের কাজ করে চলে যতীন। সামনে খোলা নোটবুকের কীপ্যাড- এর উপরে ঝড়ের গতিতে ওর আঙুলগুলো ঘোরাফেরা করছে। যেমন সবসময় করে। সামনের ভিসুয়াল মনিটরে একটার পর একটা লেখচিত্র আর অক্ষরমালার ভীড় জমে উঠছিল, জায়গা পালটাচ্ছিল, দুর্বোধ্য সব ল্যাটিন আর রোমান হরফের অংকের ফর্মুলা গুলো একটার পর একটা সেই ভীড়ের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছিল। মাঝেমধ্যে কখনো মনিটরে আঙ্গুল বুলিয়ে বিভিন্ন পিক্টোগ্রাফ জুড়ে দিচ্ছে অথবা আঙ্গুলের এক টোকায় কোনও একটাকে সরিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে কোয়ার্টি কীবোর্ডে আঙ্গুলের দ্রুত চলনে মনিটরের বুকে একটার পর একটা বাক্য গড়ে উঠছে।

"জঘন্য?", যতীন মৃন্ময়ীর দিকে তাকায় না পর্যন্ত, শুধু মুখে ফুটে ওঠে একটা নিঃশব্দ ব্যঙ্গের হাসি। "জঘন্য শব্দটা একটা একটা উপমা মাত্র। তোমার ব্যাক্তিগত মতামত সেটা হতেই পারে। তবে তার তথ্য-ভিত্তিক কোনও বাস্তব হিসেব-নিকেশ তোমার কাছে নেই। তাছাড়া - " বলতে বলতে একটু থেমে গিয়ে সামনের ভিসুয়াল মনিটরে আঙ্গুলের স্পর্শে একটা ত্রিমাত্রিক ছবিকে কয়েকটা অংশে ভেঙ্গে দেয় যতীন। "তাছাড়া এই ব্যক্তিগত পরিমাপের মধ্যে তোমার আবেগ আর ন্যাকামো ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই।"

বড়ো বড়ো চোখে স্বামীর দিকে কয়েক মূহুর্ত তাকিয়ে থাকে মৃন্ময়ী। তারপর হতাশ পায়ে ফিরে যায় রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরটা যথেষ্ট বড় এবং নানান ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ভর্তি। এই মূহুর্তে কোনো দিকে

তাকায় না বিষাদক্লিষ্ট মৃন্ময়ী। মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার একটা ব্যার্থ চেষ্টা করে। তারপর হাত দিয়ে একটা ইশারা করে ওভেনটার যান্ত্রিক চোখের দিকে। ওটা জেগে

ওঠে। চালু হয়। পাশের দেওয়ালের গা বেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা কনভেয়র বেল্ট হালকা আওয়াজ করে চলতে শুরু করে। লক্ষ্য বেসমেন্টের ভান্ডার ঘরের লকারের দিকে। কনভেয়রটার দায়িত্ব রাতের খাবারের উপাদান গুলো বেসমেন্টের ভাড়ার থেকে ওপরে নিয়ে আসা। কি কি আনতে হবে আর কতোটা করে আনতে হবে সে সমস্তই মাসের প্রথম দিনে মাদার কম্পিউটারের স্মৃতি ভান্ডারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত মৃন্ময়ী এর কখনও ভুল হতে দেখেনি। জানে আজকেও কোনও ভুল এর হবে না। এখন শুধু খানিকক্ষণের অপেক্ষা। চলন্ত হাত-খানেক চওড়া কনভেয়র বেল্টটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৃন্ময়ী ঠিক করে আরেকবার ও অনুরোধ করবে। শেষ চেষ্টা করার জন্য মৃন্ময়ী ফিরে তাকায় স্বামীর দিকে। প্রায় কাতর স্বরে, যেন ভিক্ষা চাইছে এমনভাবে বলে, "দ্যাখো, অন্তত অল্প কিছু দিনের জন্য হলেও .... কয়েকটা দিনেরই তো ব্যাপার.. একটা মাস শুধু... "

-"এক মাস কেন? এক সপ্তাহ হলেও 'না' এবং 'না' মানে 'না' । তোমার আদরের ভাই এবার এলে এটা ভালো করে বুঝিয়ে দিও। আর হ্যা, তোমার যদি বলতে খারাপ লাগে, তো আমিই না হয় বলে দেবো। কিন্তু সারাক্ষন একটা বাচ্চা ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াবে, কাঁদবে, চীৎকার করবে, এ সব কিছু আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমার অনেক কাজ করার আছে। বিটেলগুজ ইলেভেনের এই রিপোর্টটা শেষ করে আর দশ দিনের মধ্যেই পাঠাতে হবে।"

কথা বলতে বলতে যতীন আজকে ঢোকা মেইল গুলো পড়ছিল। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের একটা মেইলের উত্তরে যতীন চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া একটা ফসিলের রিপোর্ট জুড়ে দেয়। উত্তরটা পাঠিয়ে দিয়ে এবার স্ত্রীর দিকে এতক্ষণ পরে যেন একটু সময় পেলো এমন ভাব করে একবার তাকিয়ে দেখে। 'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা কি বলোতো? ও নিজে কেন নিজের ছেলের দেখভাল করতে পারে না?"

মৃন্ময়ী প্রায় ডুকরে ওঠে, বলে, "ওগো, না। একটু বোঝার চেষ্টা কর তুমি। গোলুকে আমিই এখানে আনতে চাইছি। তুমি সারা দিন ব্যাস্ত থাকো নিজের কাজ নিয়ে। হপ্তার পর' হপ্তা, মাসের পর' মাস! শেষ কবে আমাকে সময় দিয়েছ মনে করে বলতে পারবে? পারবে না! আমি কি ভাবে দিনের পর দিন কাটাই বলো তো? তাই অনেক করে বলে ক' য়ে আমি প্রভাতকে রাজি করিয়েছি যাতে গোলুকে আমার কাছে কিছু দিনের জন্য রেখে যায়। এখন তুমি যদি..."

-"আরেকটু বড়ো হোক, বুঝদার হোক তোমার গোলু। তখন না হয় আমি মেনে নেবো। এখন নয়", বিরক্তি চোখে মুখে ফুটে ওঠে যতীন দত্তের। সেটা লুকোনো কোনও চেষ্টা অবশ্য করে না সে। বলে," যাকগে মিনু, এসব কথা এখন থাক। ডিনার কি এখনও রেডি হয় নি? খেতে বসার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে। ওভেনটা আজকাল গড়বড় করছে নাকি!"

-"এই হয়ে যাবে এক্ষুনি।" মৃন্ময়ীর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ওভেনের লাল আলোটা জ্বলে ওঠে। ততক্ষণে দেওয়ালের পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে রোবট পরিচারক। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওভেনের

সামনে। ওভেনটার দরজা খুললেই ভেতর থেকে খাবার গুলো নিয়ে ডাইনিং টেবিলে পরিবেশনের জন্য একদম প্রস্তুত সে।

এখন মৃন্ময়ী বসে আছে ডাইনিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে। এখনও ফোঁপাচ্ছে। সন্ধ্যে থেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওর নাক-চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। ওদিকে যতীন লিভিং রুমে এখনও ওর কাজ করে চলেছে। ওর এই গবেষণা, এই কাজই ওর জীবন। দিনের পর দিন। কোনো সন্দেহ নেই যে ও ওর নিজের কাজের ক্ষেত্রে বাকিদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। এই মূহুর্তে পাতলা ছিপছিপে ওর শরীরটা একটা গুটিয়ে রাখা স্প্রীং-এর কয়েলের মতো নোটবুকের উপর, সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা কাগজপত্র আর ভিউ-ট্রান্সফার মনিটরের উপর যেন মিশে গিয়েছে। ওর ঠান্ডা আর নির্বিকার মুখে কোনও আবেগের চিহ্ন নেই অথচ উজ্জ্বল চোখদুটো উত্তেজনায় ব্যাস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে নোটবুক থেকে বিভিন্ন ফাইল হয়ে মনিটরের উপর। ঝড়ের মতো বিভিন্ন তথ্য দেখছে আর বিশ্লেষণ করছে। মাথায় ক্রমাগত হিসেব নিকেশ চলছে এক একটা তত্ব আর সেই তত্ত্বের সমন্বিত তথ্যের। ওর নড়াচড়া, কাজের পদ্ধতি সমস্ত কিছুই একটা মসৃন এবং তৈলমর্দিত মেশিনের মতো। মেশিনের মতোই যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবকিছু করে চলেছে। যেন পৃথিবীতে ও আর ওর কাজ ছাড়া অন্য কোনও কিছুরই কোনও অস্তিত্ব নেই।

মৃন্ময়ী ওদিকে ওর নিজের ভিতরের কষ্ট আর অপমানে এখনও কাতর। নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে চলছে। গোলু - ছোট্ট গোলুটা আমার। কি করে ও গোলুকে বলবে যে ওর এখানে থাকাটা পিসেমশাই চাইছে না? ভাবতেই আবার নতুন করে কান্না পেয়ে যায় মৃন্ময়ীর। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসে। ছোট্ট গোলুমলুটাকে এ বাড়িতে আর আনা যাবে না! আর কখনও না! কেন? না শিশু সুলভ খিলখিলে হাসি আর খেলাধুলা ওনার পছন্দ নয়। ওনার ঐ গবেষণায় নাকি ব্যাঘাত ঘটে! ব্যাঘাত তো ঘটে অবশ্যই। নইলে কি আজ এতদিন পরেও এমন একাকী দিন রাত পার করতে হয় মৃন্ময়ীকে!

একটু পরেই ওদিকে রান্নাঘরে ওভেনটার সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লিক করে শব্দের আওয়াজ। ঢাকনাটা খুলে গিয়েছে। খাবার গুলো ওভেনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সরাসরি রোবট পরিচারকের বাড়ানো ধাতব হাতে ধরে রাখা একটা ট্রে-র ওপরে। একটা হালকা টিংটং শব্দে বাজনা বেজে উঠে জানান দেয় যে ডিনার এবার তৈরি।

মৃন্ময়ী কিছু বলার আগেই যতীন বলে ওঠে, "ঠিক আছে। আমি শুনেছি।" নোটবুক আর মনিটরটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় এবার। বলে, "আমার তো মনে হয় আমরা খেতে খেতেই ওরা এসে পৌঁছে যাবে।"

-"আমি প্রভাতকে বরং ফোন করে বলে দিই যে -"

-"না। ও বরং এখানে চলেই আসুক আর পুরো ব্যাপারটা সামনা সামনি ঠিক হয়ে যাক।" যতীন অধৈর্য্য হয়ে রোবট পরিচারককে বিরক্তি দেখায় এবার, "ঠিক আছে। এবার নামাও ওগুলো।" রাগে গজগজ করে

যতীন।" ধ্যাৎতেরি। কি হচ্ছেটা কী? ফেলবে নাকি সব কিছু? দাও ঠিক করে। আমাকে তো আবার কাজে বসতে হবে নাকি! "

মৃন্ময়ী বহু কষ্টে চোখের জল আটকায়। ওর সামনেও টেবিলের উপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে দেয় রোবোট পরিচারক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোলু ওরফে প্রতীক এবং প্রভাত

মৃন্ময়ীর ভাগ্য অল্প হলেও সদয় হলো শেষ পর্যন্ত। যতীন কোনও রকম সুযোগ পেলই না প্রভাতকে কিছু বলার। গোলুকে প্রভাত ওদের ওখানে নামিয়ে দিয়েই চলে গেলো। কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল ওর। তখন মৃন্ময়ীদের খাওয়া প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। গোলুকে ঢুকতে দেখে সব ভুলে গেল মৃন্ময়ী। আনন্দে প্রায় চীৎকার করে ওঠে ও। চামচ-টামচ প্লেটে প্রায় ছুড়ে ফেলে, এক দৌড়ে গিয়ে গোলুকে কোলে তুলে নিয়ে জাপটে ধরে দুহাতের মধ্যে তুলে নেয়। জড়িয়ে ধরে গোলুর দুগালে চুমু দিতে দিতে বলে, "ওলে আমার গোলুমলুটারে!"

"ও পিম্মি, ছাড়ো ছাড়ো, তুমি আমার টাইগারকে চেপ্টে দেবে যে!", গোলু ওর পিসির চুমুর চাপে খিলখিলিয়ে ওঠে। ওর হাতের থেকে ছোট্ট বাদামী রঙের একটা বেড়াল ছানা লাফিয়ে নামে মেঝের কার্পেটের উপর আর এক মূহুর্ত পরেই ওটা এক দৌড়ে গিয়ে লুকোয় সোফার নীচে। গোলুবাবু এতে আরও মজা পেয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠে আঙ্গুল দিয়ে ওর পিম্মিকে দেখায়. "ঐ যে লুকিয়ে পড়েছে দ্যাখো!" যতীন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিলো। দেখছিল সোফার তলা থেকে বেরিয়ে থাকা বাদামী লেজের অংশটুকু আর তার মালিক ছোটো খোকনটিকে। বললো, "খোকা, ওটাকে তুমি টাইগার বলছো কেন? টাইগার কি ঐ বেড়ালটার নাম? ওটা তো দেখছি আসলে একটা আস্তাকুড়ের বেড়াল!"

গোলু রাগ করে। ও রাগ দেখায়। মুখ ফুলিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, "না .. আ .. । ও টাইগার। ওর গায়ে ডোরা কাটা আছে দেখছো না?"

পিসেমশাই তাও মানতে নারাজ। "উহু, টাইগার হলুদ রঙের হয়। আর সাইজে এর চেয়ে অনেক বড়ো হয়। তোমার তো এতোদিনে এ সব শিখে যাওয়ার কথা!"

মৃন্ময়ীর খারাপ লাগে। ও বাধা দেয়। যতীনকে অনুরোধ করে বলে, "প্লিজ, যতীন। ছাড়ো না!"

কিন্তু ওর স্বামী ছাড়ার পাত্রই নয়। রাগত স্বরে যতীন মৃন্ময়ীকে বলে, "থামো তো তুমি। প্রতীক এখন আর অতটাও ছোটো নেই যে বাচ্চামো করলে চলবে। ওর এখন বাস্তবটা চিনতে শেখা উচিত। দেশের মনপরীক্ষকদের হলটা কী? ওরা কেন এর এই বোকাবোকা হাবভাব ঠিক করছে না!"

গোলু দৌড়ে গিয়ে ওর টাইগারকে কোলে তুলে নেয়। বলে, "ছেড়ে দাও আমার টাইগার কে। তুমি একদম ধরবে না" , দু হাতে বেড়ালটাকে জাপটে রেখে হাঁফায় গোলু অল্প অল্প।

বাড়ানো হাতটাকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বেড়াল বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকে যতীন। তারপর একটা অদ্ভুত শীতল হাসি ওর দু ঠোঁটের পাশ থেকে ধীরে ধীরে গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, "আচ্ছা, আচ্ছা,

ঠিক আছে, গোলু। চলো, তোমাকে একদিন আমাদের ল্যাবে নিয়ে যাবো। ওখানে তোমাকে অনেক অনেক বেড়াল দেখাবো। ওগুলো সব আমাদের গবেষণার কাজে লাগে। বেড়াল, গিনিপিগ, খরগোশ আর - "

মৃন্ময়ী চাপা স্বরে চীৎকার করে ওঠে, "যতীন! তুমি কেন এমন করছো!"

হালকা করে হেসে ওঠে যতীন। হঠাৎই উঠে চলে যায় লিভিং রুমে নিজের কাজের টেবিলে। ওখান থেকেই ওর গলার আওয়াজ আসে এবার, "ঠিক আছে, তোমরা এখন এখান থেকে যেতে পার। আমার কাজ গুলো শেষ করার আছে। আর হ্যা, যা বলেছিলাম। প্রভাত তো সটকে গেল। গোলুকে কিন্তু ওটা বলতে ভুলো না।"

গোলু এতক্ষণে এবার মজা পায়। ওর গোল গোল চোখ দুটো উত্তেজনায় ঝক্ ঝক্ করে ওঠে, "কী গো? আমার জন্য কিছু আছে নাকি? কোনো গোপন কিছু?"

গোলুর এই খুসিতে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ীর হৃদয় মোচড় দিয়ে কেঁদে ওঠে। হাত বাড়িয়ে গোলুর কাঁধে হাত রেখে বলে, "চলে এসো গোলু সোনা। চলো আমরা বাইরের বাগানে গিয়ে বসে কথা বলি। তোমার টাইগারকেও নিয়ে এসো।"

সেই মূহুর্তে লিভিং রুমে একটা ক্লীক করে আওয়াজ হলো। মনিটরের জরুরী ঘোষণা নির্দেশক লাল আলোর বোতামটা দপ্ দপ্ করছে। যতীন তড়িঘড়ি নোট বুকটা টেনে সামনে এনে ভাঁজ খুলতে খুলতেই হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীদের দাঁড়াতে ইশারা করে। বলে, "একটু চুপ করে দাঁড়াও। কথা বলবে না আর কেউ " , ওর দু হাতের আঙ্গুল দ্রুতগতিতে নোটবুকের কী-প্যাডের উপর চলতে থাকে। মনিটরের পর্দায় পরপর কয়েকটা উইন্ডো খুলে যায়। একটা উইন্ডো যতীনের আঙ্গুলের টানে বড়ো হয়ে গিয়ে সংকেত শব্দের জন্য অপেক্ষা করে। যতীন মনিটরের একটা দিকের প্যানেলে নিজের মুখটা এগিয়ে দিতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওর চোখের মণিটা স্ক্যান হয়ে গিয়ে একটা ফাইল খুলে যায়। যতীন গভীর মনোযোগ দিয়ে ফাইলটা পড়তে শুরু করে।

মৃন্ময়ী জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার? কোন খারাপ খবর না কি?"

"খারাপ?", পড়তে পড়তে যতীনের মুখ চকচকে হয়ে ওঠে। "আরে, না, না। বরং খুব ভালো একটা খবর বলতে পারো" , বলেই ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। "আর হ্যাঁ, হাতে খুব বেশি সময় কিন্তু নেই। দেখা যাক। একটু তাড়াহুড়োই করতে হবে - "

-"কি হয়েছে?"

-"আমাকে একবার বাইরে যেতে হচ্ছে। এই ধরো সপ্তাহ দুই বা তিনেকের জন্য। রেক্সর ফোরের এবার আবার আমাদের মহাকাশ মানচিত্রের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছোনোর সময় হয়েছে।"

-"রেক্সর ফোর! তুমি যাবে ওখানে?", উত্তেজনায় মৃন্ময়ী হাত মুঠো করে ঝাঁকায়, "বাঃ, দারুণ ব্যাপার! এই জানো, আমার না বহুদিনের ইচ্ছে একটা ঐ রকম পুরোনো কোনো গ্রহে যাওয়ার, আঃ – প্রাগৈতিহাসিক সব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন নগর! যতীন, আমিও যাবো। আমি কি যেতে পারি তোমার সঙ্গে?

কতোদিন আমরা কোথাও ঘুরতে যাইনি বলোতো! তুমি তো সবসময়ই পরেরবার নিয়ে যাবে বলে বলতে থাকো-”

যতীন দত্ত বড়ো বড়ো চোখে হতবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, “তুমি? তুমি যাবে সঙ্গে?” ওর মুখে আবার সেই ব্যাঙ্গের হাসিটা ফুটে ওঠে। মৃন্ময়ীর মুখ কালো হয়ে যায়। যতীন এবার বলে, “যাকগে, এখন তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। এই ট্যুর-টার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করে আছি আমি।” নিজের দু হাতের তালু ঘষতে থাকে যতীন। হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ আনন্দ হচ্ছে ওর। আনন্দের চোটেই হোক বা অন্য কোনো কারনে, যতীন মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, “আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি তোমার গোলুকে এখানে রাখতে পারো। তবে ব্যাস, ঐ ততদিনই কিন্তু”। তারপর যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমন ভাবে বলে ওঠে, “আঃ হাঃ, রেক্সর ফোর! আমি আসছি!”

তৃতীয় অধ্যায়

মৃন্ময়ী এবং প্রভাত

মৃন্ময়ী আর প্রভাত যতীনদের বাড়ির পেছনের বাগানের লনে বসেছিল। গোলু ওর বেড়ালটার সাথে দৌড়োদৌড়ি করে খেলছে। মৃন্ময়ীর চোখ গোলুর দিকে। গোলু যেদিকে যাচ্ছে মৃন্ময়ীর চোখ সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে। অনেক দিন পরে দিদির মুখে সেই আগের উজ্জ্বল ঝকঝকে ভাবটা যেন ফিরে এসেছে। প্রভাত তাকিয়ে ছিল দিদির দিকেই। “তোর খোরপোষের ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। যতই হোক যতীন একজন উঁচু পদের বৈজ্ঞানিক। কাজেই . . . ”

-“ছাড় তো ওসব চিন্তা” , মৃন্ময়ী বলে ওর ভাইকে। “আমি শুধু মুক্তি চাই। ও রেক্সর ফোর থেকে ফিরে এলেই আমি জানিয়ে দেবো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।”

প্রভাত চুপ করে থাকে। মুখ দেখে ওকে চিন্তিত মনে হয়। ও ঘাসের উপড় পা দুটো লম্বা করে টানটান করে দেয়। একটু পরে ও দিদির দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে। তারপর বলে, “দ্যাখ, যতীনের সঙ্গে তোর

একবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তারপর তো তুই চাইলেই আবার বিয়ে করতে পারবি। তুই এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। তাই না?”

মৃন্ময়ী ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “সে তো একশো বার। তুই বাজি রাখতে পারিস। আমার কোনও আপত্তিও নেই। আর হ্যাঁ, তোর কিন্তু এমনিতেই ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি তোর ঘাড়ে চাপবো না। এমন কাউকে না কাউকে নিশ্চই পাবো যে বাচ্চা পছন্দ করবে।”

প্রভাত-ও হাসে। অনেক দিন পর দিদিকে আজ প্রাণবন্ত লাগছে ওর। দিদি ওর ঘাড়ে চাপলে ও-যে কত খুসি হবে তা কি দিদি জানে না? বিনতা হঠাৎ করে অসময়ে চলে গেল। চাকরি-বাকরি সামলে একা একা গোলুকে মানুষ করতে গিয়ে ওকে যে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে সেটা দিদি ভালোই জানে। তাই দিদি

যদি ওর কাছে এসে থাকে তাতে গোলু যে কতটা খুসি হবে সেটাও ওরা দুজনেই জানে। কিন্তু এটাও সত্যি যে গোলুর স্বার্থে ও দিদির নিজের জীবনটা ব্যার্থ হতে দিতে পারে না।

দিদির দিকে তাকিয়ে ও বলে, "তুই বাচ্চাদের খুব ভালোবাসিস তাই না রে? গোলু যে তোর কাছে আসবার জন্য কতটা ছটফট করতে থাকে! কিন্তু ও পিসেমশাইকে একদমই পছন্দ করে না। যতীন বড্ড বেশি ওকে খোঁচায়।"

–"আমি জানি। যতীন রেক্সর ফোরে যাওয়ার পর থেকে এই সাত দিন আমাদের দুজনের যে কি আনন্দে কেটেছে!", মৃন্ময়ী হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুল গুলো ঠিক করে নেয়। তারপর আবার বলে, "আমরা অনেক অনেক মজা করেছি, জানিস? অনেক দিন পর নিজেকে মনে হচ্ছিলো আবার সেই ছোটবেলার মজার দিন গুলো ফেরত এসেছে।"

প্রভাত হঠাৎ প্রশ্ন করে, "যতীনদা কবে ফিরছে?"

–"যে কোন দিন" , হাত মুঠো করে শক্ত করে সেদিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ী বলে, "পাঁচ বছর হয়ে গেলো বিয়ে হয়েছে আমাদের – আর প্রত্যেকটা বছর যেন আগের বছরের চেয়ে আরও বেশি খারাপ। ও এতো – এতো অমানুষ। একেবারে নিস্পৃহ আর নিষ্ঠুর। শুধু ও নিজে আর ওর নিজের কাজ। দিন আর রাত শুধু ঐ নিয়ে পড়ে আছে।"

–"যতীনদা বড়ো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ও ওর নিজের জায়গায় সবচেয়ে উঁচু চেয়ারটার উপর পৌছোতে চায়" , এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রভাত সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, "ডিআরডিও-র সব লোকগুলোই কি আর ঐ রকম? নিশ্চয়ই নয়। যতীনদা নিজেই হয়তো একজন উঁচু ডালের পাখি। আমি নিশ্চিত যে একদিন ঠিক মগডালে উঠে পড়বে। যতীনদা এখন কি নিয়ে যেন কাজ করছে?"

–"টক্সিন না ঐ কি যেন একটা বিষ বিজ্ঞান। আন্তর্নক্ষত্র সামরিক বাহিনীর জন্য নতুন ধরনের কিছু বিষ নিয়ে কাজ করছে। কিছুদিন আগেই কপার সালফেট মিশিয়ে ত্বকের উপর ব্যবহারের জন্য কি একটা বিষ আবিষ্কার করেছে। এখন আবার বিটলগুজ ইলেভেনের আদিবাসীদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলার গ্যাস নিয়ে কাজ করছে।"

–"এটা একটা ছোটো মাঠের খেলা। খেলোয়াড় সংখ্যাও খুবই কম। তাই আকচা-আকচি মারাত্মক। আমার যেমন আবার অন্য রকম –", প্রভাত পেছনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে এবার। "এই দেশে আমার মতো কয়েক হাজার ছাড়পত্র আইনজীবী আজকে আন্তর্নক্ষত্র নাগরিকত্ব কমিশনে কাজ করছে। আমি বছরের পর বছর এই নাগরিকত্ব কমিশনে কাজ করে যাবো কিন্তু তোলপাড় করা কোনও ঘটনা ঘটাতে পারবোনা। অবিশ্যি এই রকম সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমি থেকে যেতে চাই। এতেই আমার আনন্দ।"

–"যতীন যদি এরকম হতো!"

–"হয়তো যতীনদা একদিন পাল্টে যাবে।"

–“ও কখনোই পাল্টাবে না” , মৃন্ময়ীর গলায় তিক্ত অভিজ্ঞতার আভাস, “এটা আমি এতোদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছি। সেজন্যই এবার আমি এসব ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। ও সারা জীবন ঐ একই রকম থেকে যাবে। থাকুক।”

চতুর্থ অধ্যায়

যতীন

যতীন দত্ত রেক্সর ফোর থেকে ফিরে এলো একদম অন্য মানুষ।

শীস দিতে দিতে ঘরে ঢুকে ওর অভিকর্ষরোধী সুটকেসটা অপেক্ষারত রোবট পরিচারক রোবুর হাতে দিতেই যখন রোবু যতীনকে বললো, “ধন্যবাদ স্যার” , আর তার প্রত্যুত্তরে যখন যতীন হেসে রোবুকে ফিরে বললো, “ধন্যবাদ” , তখন মৃন্ময়ীর দম আটকে গেলো, কথাও যেন আটকে গেলো। কোনোরকমে ওর মুখ থেকে শুধু বেরোলো, “যতীন…তুমি…”

যতীন ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে প্রাচীন সেই এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতীক মহারাজের স্টাইলে কোমর ঝুঁকিয়ে প্রায় জাপানী কায়দায় বলে উঠল, “শুভ সন্ধ্যা, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, তোমাকে কিন্তু এই মুহূর্তে দারুণ লাগছে। হে, তন্বী তরুণী, শ্যামলিম তনু, শিখরোজ্জ্বল দশন পুট,

পক্ক বিম্ব অধর ওষ্ঠ, ক্ষীণ কটি তার, নাভিটি কূট,

চকিত-হরিণী নয়নের দিঠি, অলস গমনা শ্রোণীর ভারে;

কুচ চাপে নত যুবতী- যেন বা বিধাতে প্রথম সৃজিল তারে।” ,

বলতে বলতে যতীন থেমে গিয়ে বড়ো করে শ্বাস নিয়ে নাক টানতে টানতে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, “আহা হা, কি যেন এক দারুণ খাবারের গন্ধ পাচ্ছি আমি! কী বানাচ্ছো আজ প্রিয়তমে?”

মৃন্ময়ীর দম আটকেই ছিল, এবার চোখ প্রায় ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। বুকের ভেতরে যেন এক অভূতপূর্ব শিরশিরানি টের পাচ্ছে এখন মৃন্ময়ী। কোনোরকমে বলতে পারে শুধু, “ও যতীন! তোমার কী হয়েছে? তুমি – তুমি কেমন যেন অন্যরকম লাগছো।”

–“তাই? অন্যরকম মনে হচ্ছে আমাকে? ”, কথাটা বলতে বলতে যতীন ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিকে পায়চারি করে, এটা ওটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে আর বলতে থাকে, “ঘর, আমার ছোট্ট ঘর, আমার ভালো বাসা। তুমি জানো না মৃন্ময়ী, এখানে ফিরে আসাটা যে কি আনন্দের। কী-ই যে ভালো লাগছে আমার। বিশ্বাস করো।”

মৃন্ময়ী যতীনকে দেখতে দেখতে বলে, “আমার বিশ্বাস করতে ভয় করছে গো।”

–“ভয় করছে? কেন?”

–“যে তুমি সত্যি সত্যিই এই সব কথা গুলো বলছো। তুমি তো এমন করে কখনো বলোনি আগে। আগের তুমি তো অন্যরকম ছিলে।”

–“কেমন ছিলাম?”

–“মানে, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, অনেকটা স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর।”

–“আমি? ঐ রকম?”, যতীন ভ্রু কুঁচকে মৃন্ময়ীকে দেখে। মেঝের দিকে তাকায়। ঠোঁট চাটে। স্বগোতক্তির মতো করে বলে, “হুমম! আশ্চর্য!” তারপর হঠাৎই ওর চোখ মুখ উজ্বল হয়ে ওঠে। মৃন্ময়ীকে বলে, “যাকগে। ভুলে যাও ঐসব পুরনো কথা। সে সব অতীত। এখন বলোতো সোনা আজকের ডিনারে কী আছে? খিদেয় আমার পেটে ছুঁচোয় লাফালাফি শুরু করছে।”

মৃন্ময়ীর কেমন যেন ভয় ভয় করে। খুব করে চাইছে লোকটা সত্যিই যেন পাল্টে গিয়ে থাকে। কিন্ত তা কি বাস্তব? এতো ভালো কি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে? এক্ষুনি হয়তো হা হা করে ব্যাঙ্গের হাসি হেসে উঠে সেই পুরোনো যতীন বেরিয়ে আসবে! যতীনের দিকে নজর রাখতে রাখতে মৃন্ময়ী রান্নাঘরের দিকে এগোয়। বলে,

“সে যা তুমি খেতে চাইবে। তুমি তো জানোই যে আমাদের ওভেনের প্রোগ্রামে সব রকম খাবারের মেনু তৈরি করা আছে। শুধু হুকুম করলেই হয়ে যাবে।”

–“সেই তো! হ্যাঁ সে তো বটেই” , যতীন গলা খাকারি দিয়ে খক্ খক্ করে কেশে ওঠে কয়েকবার। তারপর বলে, “তাহলে হয়ে যাক, তন্দুরী, রুটি, সাথে স্যালাড আর চিকেন ভর্তা। আর শেষ পাতে একটু সেমুয়ের পায়েস। আইসক্রিম আছে ফ্রীজারে?”

মৃন্ময়ী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবার, চিন্তিত স্বরে বলে, “তুমি কিন্তু আগে কখনও খাবার দাবারের সম্পর্কে এতোটা খেয়াল রাখতে না!”

–“তাই?”

–“উল্টে তোমার বক্তব্য ছিল কবে খাবারের পিল তৈরি হবে অথবা ইনজেকশনের সিরিঞ্জে করে খাবার শরীরের মধ্যে এক মিনিটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে খাওয়া টাওয়ার জন্য সময়ের অপচয় না হয়” , তীক্ষ্ণ নজরে মৃন্ময়ী স্বামীকে জরিপ করে, “যতীন, তোমার কী হয়েছে?”

–“কিছু না। কী হবে? কিচ্ছু হয় নি তো!”, যতীন তড়িঘড়ি পকেট থেকে পাইপটা বার করে লাইটার জ্বেলে ওটা ধরিয়ে নেয়। হাত কেমন যেন একটু একটু কাঁপছে। খানিক তামাক পাতার গুড়ো আঙ্গুলের ফাঁক গলে ছড়িয়ে পড়ে নিচে কার্পেটের উপর। যতীন তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে একটা একটা করে ওগুলো তুলতে থাকে। তখনও মৃন্ময়ী ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, “আরে, যাও না তুমি। রান্নার ব্যাপারটা জলদি দেখো। যদি বলোতো আমিও আসতে পারি তোমাকে সাহায্য করতে – আসবো আমি?”

–"না, না," মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। "আমি একাই পারবো। ঐ টুকুতো কাজ। সবই তো আসলে করবে রোবু আর ওভেন। তুমি যাও, তোমার কাজ নিয়ে বসতে চাইলে বসতে পারো।"

–"কাজ?"

–"তোমার গবেষণা গো। ঐ টক্সিন।"

–"টক্সিন!", যতীন কে একটু দ্বিধাগ্রস্ত লাগে। তবে একটু পরেই বলে, "ওঃ। টক্সিন! আপাতত দিলাম বিদায়।"

–"কী? মানে?"

–"মানে – ইয়ে হয়েছে। আসলে খুবই ক্লান্ত লাগছে এখন কেমন যেন। কাজকর্ম সব পরে হবে।" উদ্দেশ্যহীন ভাবে যতীন ঘরের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে করতে বলে, "আমার কেন যেন খালি ইচ্ছে করছে শুয়ে বসে আরাম করি বাড়ি ফিরে আসাটা উপভোগ করতে। বিশেষ করে ঐ দুঃস্বপ্নের রেক্সর ফোর থেকে চলে আসার পর!"

–" রেক্সর ফোর কি দুঃস্বপ্ন ছিল?"

–"ভয়াবহ রকমের দুঃস্বপ্ন," যতীনের নাক মুখ কুঁচকে যায় মনে করতে গিয়ে, "পুরো শুকিয়ে যাওয়া পুরোনো একটা গ্রহ। প্রাচীন। নক্ষত্রের তাপে আর হাওয়ায় চিমড়ে গিয়ে শুকনো মন্ডের মতো হয়ে গিয়েছে। এখন একটা ভয়ংকর জায়গা ওটা।"

–"সে কি! শুনে তো খুবই খারাপ লাগছে। জানো, আমার না বহুদিনের ইচ্ছে যে ওখানে একবার যাবো! "

–"হায় ভগবান!", যতীন প্রায় আঁতকে ওঠে, "তুমি এখানেই থাকো গো। এই আমার সাথে। আমার পাশে। এই আমরা দুজনে – দুজন মিলে এক সাথে।" দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায় যতীন।

"উঁহু, একি পাগল হয়ে গেলে নাকি? এখন না . . . এখন না! ", পিছিয়ে যায় মৃন্ময়ী। ওর বুকটা ধকধক করছে। তবে কি আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছিল? নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। খামোখা ও লজ্জা পেয়ে সরে এল। নাকি এই অভাবিত সৌভাগ্য এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি?

লাজুক মুখে যতীনও পিছিয়ে গেল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায় ঘরের ভেতর – একদিক থেকে অন্যদিকে। কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হঠাৎ বলে ওঠে, "পৃথিবী ভারি

সুন্দর এক জায়গা গো। খুব নরম আর প্রাণবন্ত," বলে মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হাসে, "একদম ঠিক ঠাক। বেঁচে থাকার জন্য। 'তীরে তমালের ঘন ছায়া– / আঙিনাতে / যে আছে অপেক্ষা করে, তার / পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' ।"

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভাত এবং মৃন্ময়ী

সেই একই জায়গা। বাড়ির পেছনের বাগানের সেই লনেই ওরা বসে আছে। দুপুর হতে এখনও খানিক দেরি আছে।

মৃন্ময়ী আশ্চর্য হয়। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "কী বলছিস? আমি তো তোর কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!"

-"তোর বেশি বোঝার দরকার নেই। তুই শুধু আমাকে পুরো ব্যাপারটা, যতটুকু তোর মনে আছে ঠিকঠাক ভেবে পরপর কী হল আরেকবার বল।"

প্রভাতের কোলের ওপর ওর অফিসিয়াল ডাইরিটা খোলা। রোবট পেনসিলটা ডাইরির খোলা পাতার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃন্ময়ী বলতে শুরু করলেই ওর বলা কথা গুলোকে ডাইরির পাতায় লেখা হয়ে যাবে।

মৃন্ময়ী উত্তর দেয় না। চুপ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে প্রভাত আবার বলে, "মানে তুই যতীনদার মধ্যে যা যা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিস এখনও পর্যন্ত তার যতটা যা মনে আছে বলে যা। আমি শুনছি।"

-"কেন?"

-"এমনই । তুই বল না!"

-"কী?"

-"তুই বললি না যে তোর প্রথমেই কেমন একটা খটকা লেগেছিল? যে এই যতীনদা যেন আলাদা লোক?"

-"সে তো সঙ্গে সঙ্গেই। ওর মুখ চোখের হাবভাব। আগের মতো নিস্পৃহ কাঠখোট্টা মনে হচ্ছিলো না। একটু যেন নরম-সরম, সহজ আর সহনশীল। কেমন একটা শান্ত ভাব।"

-"হুমম্," প্রভাত বলে, "আর কী কী?"

মৃন্ময়ী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার খিড়কি দরজার দিকে নজর করে। ওর চোখে মুখে একটা ভয়ের ছাপ যেন ফুটে ওঠে। প্রভাতের নজর এড়ায় না ব্যাপারটা।

মৃন্ময়ী জিজ্ঞেস করে, "হ্যা রে, আমাদের কথাবার্তা ও শুনতে পাচ্ছে না তো, নাকি পাচ্ছে?"

-"না। যতীনদা তো এখন গোলুর সঙ্গে খেলছে ভেতরে। আজকে ওরা উদবেড়াল শিকারী হয়েছে। তোর বর একটা উদবেড়াল বানিয়েছে ল্যাবের ভেতরে। আমি ওটাকে ওদের খুলতে দেখে এলাম একটু আগেই।
"

-"ওর কথাবার্তা - " উঠে পড়ে মৃন্ময়ী। লনের উপর পায় চারি করতে থাকে।

-"ওর কী?"

–"যে ভাবে সাধারণত ও কথা বলে ঠিক তেমন না। কেমন যেন আলাদা! বিশেষ করে ওর শব্দচয়ন। এমন এমন শব্দ যা ও আগে কোনোদিন ব্যবহার করে নি। নতুন ধরনের বাক্য গঠন। উপমার ব্যবহার। আমি আগে কোনোদিন ওকে উপমা ব্যবহার করতে শুনিনি। বরং ও বলতো উপমা হচ্ছে ভুলভাল জিনিস। বাক্যের অর্থই না কি উল্টে দেয়। আর ..."

–"আর কী? চুপ করলি কেন, বল?"

–"আর ... অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দ। পুরোনো কালের। যে গুলো আজ আর কোথাও শুনতে পাবি না।"

–"প্রাচীন শব্দ – প্রাগৈতিহাসিক বাগবৈশিষ্ট?", এবার প্রভাতের কৌতুহল যেন ক্রমশঃ বাড়ছে।

–"হ্যাঁ, ঐ ধরনেরই" , মৃন্ময়ীর পায়চারির গতিবেগ বেড়ে গেছে। হাতদুটো প্লাস্টিকের সর্টস্-এর পকেটে ঢুকিয়ে পায়চারি করতে করতে প্রভাতের সামনে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, "অপ্রচলিত সব শব্দ আর পুরোনো দিনের মতো বাক্য গঠন।"

–"এমন কিছু যা এখনকার বইতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পুরোনো ক্লাসিক্সে পাওয়া যায়। ঠিক সেইরকম, তাই না?"

–"ঠিক বলেছিস। তুইও খেয়াল করেছিস?"

–"হ্যাঁ। আমিও করেছি," প্রভাতকে গম্ভীর মনে হয়, "তুই বলে যা।"

মৃন্ময়ী দাঁড়িয়ে পড়ে। "তুই কি ভাবছিস? তোর কি কিছু গোলমাল লাগছে? কোনো বিশেষ ধারণা?"

–"তার আগে আমাকে আরও জানতে হবে। আমি আরও তথ্য দরকার। তুই বলে যা।"

মৃন্ময়ী একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, "ওকে আজকাল দেখছি খেলছেও। গোলুর সাথে – ভাব একবার! খেলছে, হাসি-ঠাট্টা করছে। মজার মজার গল্প বলছে – যদিও সে সব কোন পুরোনো কালের। সেই ঈশপের

গল্প . . . বেতাল পঞ্চবিংশতি . . . সেদিন তো গোলুকে ঐ সেই কালিদাসের গাছের ডালে বসে সেই ডালটাই কাটার গল্প বলছিলো। আর, হ্যাঁ – আজকাল ও খাচ্ছেও।"

ভ্রু-টু কুঁচকে প্রভাত শুনছিলো মনযোগ দিয়ে। বললো, "মানে? যতীনদা কি আগে খেতো না?"

–"তা নয়। মানে এখনকার মতো নয়। আগে শুধু খেতে হয় বলে খেতো। আর এখন নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে যাচ্ছে আর নানারকমের খাবার টাবার এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে বানাচ্ছে। রোবু আর ওভেনটার সঙ্গে মিলে কতো যে সব বিদঘুটে আইটেম এ ক' দিনে রান্না হয়েছে!"

–"আমার তো মনে হয় যতীনদা বেশ কয়েক কেজি ওজন-ও বাড়িয়ে নিয়েছে!"

–"অন্তত চার-পাঁচ কেজি তো নিশ্চিত। এখনতো খালি খাওয়া, মজা করা আর খেলা ছাড়া আর কোন কাজ নেই! আজকাল সব সময়ই একদম নরম ব্যবহার – সব্বার সঙ্গে, বলতে বলতে মৃন্ময়ী যেন লজ্জা পায়। দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, "এমন কি আজকাল আশ্চর্যজনক ভাবে ও রোমান্টিক-ও হয়ে উঠেছে – যা আগে ও অযৌক্তিক ব্যাপার-স্যাপার বলে মনে করতো। তাছাড়া ইদানিং দেখছি ওর কাজকর্মেও আর কোন উৎসাহ নেই। ঐ টক্সিন আর বিটলগুজ ইলেভেন তো বোধহয় ভুলেই গিয়েছে।"

–"হুমম্।" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবছিলো প্রভাত। জিজ্ঞেস করলো, "আর বিশেষ কিছু?"

–"আরেকটা জিনিস আমাকে খুব বেশি করে ভাবাচ্ছে বুঝলি। এটা গত কয়েকদিন-ই আমি বারবার খেয়াল করেছি।"

–"কি সেটা?"

–"ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের থামতি আমার নজরে – "

সেই মূহুর্তে একটা হাসির দমক ফেটে পড়ে এই বাগানে। যতীন দত্ত হো হো করে হাসতে হাসতে খিড়কির দরজা খুলে বাগানে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। ওর চোখ মুখ খুসিতে উচ্ছল। আর ওর পেছন পেছন বেরিয়ে আসে গোলু-ও। দুজনেই কোনো কারনে খুব হাসছে।

যতীন আর গোলু হাঁফাতে হাঁফাতে মৃন্ময়ীদের কাছে এসে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ী আর প্রভাত অবাক হয়ে ওদের দেখতে থাকে।

গোলুর গোলগাল ফোলা ফোলা মুখটা ঘর্মাক্ত, প্রচুর হুটোপাটি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এখন বড়ো বড়ো চোখে পিম্মির দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রয়েছে যে মনে হচ্ছে পেছনে একটা বিশাল কিছু ব্যাপার নিশ্চই আছে।

যতীন গলা চড়ায়, "আমাদের একটা ঘোষণা করার আছে।"

গোলু ওর রিনরিনে গলায় প্রতিধ্বনি তোলে, "হ্যাঁ, ঘোসোনা আছে।"

প্রভাত তড়িঘড়ি ওর ডাইরিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। স্বয়ংক্রিয় পেনসিলটাও ডাইরির পেছন পেছন নিজেই প্রভাতের পকেটে ঢুকে পড়ে।

যতীন গোলুকে বলে, "তুমিই বলো" । হাত ধরে গোলুকে টেনে মৃন্ময়ীদের সামনে এনে দাঁড় করায়।

গোলু ওর মাথাটা ওপরের দিকে তুলে পিম্মির দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি এবার থেকে তোমার কাছেই থাকবো" , বলেই উদ্বিগ্ন মুখে মৃন্ময়ীর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে। "পিসাই বলেছে যে আমি তোমার কাছে থাকতে পারি। সবসময়ের জন্য। পারি তো থাকতে? ও পিম্মি?"

আনন্দে মৃন্ময়ীর বুক ভরে যায়। ও গোলুর দিক থেকে চোখ তুলে যতীনকে দেখে। যতীন-ও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কথা বলতে গিয়ে মৃন্ময়ীর গলা ধরে যায়। প্রায় ফিসফিস করেই যেন যতীনকে বলে, "ঠিক তো যতীন? তুমি এটাই বলতে চাইছো তো?"

যতীন হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর কোমর জড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনে। তারপর মৃন্ময়ীর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলে, "নিশ্চই মিনু" , আর যতীনের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ী টের পায় ওর স্বামীর চোখের

দৃষ্টিতে নরম একটা ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে। শুনতে পায় যতীন বলছে, "আমরা কি তোমাকে ঠকাবো না কি? বলো?"

গোলু শুনতে পেয়ে চিৎকার করে, "না, না পিস্মি। আর কেউ কাউকে ঠকাবে না" । গোলু ওর ছোটো ছোটো দু হাতে পিস্মি আর পিসাইকে আঁকড়ে ধরে। বলে, "আর কখনও না।"

প্রভাত একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। সেল ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছিলো। ওর মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছে। কী কথা হচ্ছিল সেটা শুনতে না পেলেও ভাইয়ের চোখে মুখের কাঠিন্যতা মৃন্ময়ীর নজর এড়িয়ে যায় না। ও গোলু আর যতীনকে ছেড়ে দেয়। প্রভাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে? কোনো প্রবলেম?"

প্রভাত ওর দিদির দিকে তাকায় না। মৃন্ময়ীর চোখের দিকে না তাকিয়ে ও যতীন দত্তের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যতীনকে বলে, "আপনার খেলা টেলা হয়ে গেলে বলবেন। আপনাকে নিয়ে আমি একটু বেরোবো।"

প্রভাতের গলার স্বরে কিছু একটা ছিলো যা মৃন্ময়ীর কান এড়ায় না। ওর ভেতরটা ছ্যাত্ করে ওঠে। একটা ঠান্ডা শিরশিরানি ও ওর ভেতরে টের পায়। উদ্বিগ্ন স্বরে ও ভাইকে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে? কোথায় যাবি তোরা? আমাকেও নিয়ে চল তবে।"

প্রভাত মাথা নাড়ে। লম্বা পা ফেলে যতীনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, "চলুন যতীনদা। বেরোনো যাক। আপনি আর আমি একটু ঘুরে আসি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভাত এবং যতীন

তিন জন কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র প্রতিনিধি যতীন দত্তের চারদিক ঘিরে কয়েক ফুট দূরত্ব রেখে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের হাতের স্পন্দন নল যতীনের দিকে উদ্যত।

আঞ্চলিক ছাড়পত্র নির্দেশক দিবাকর সোম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়েই যতীনকে পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘুরে প্রভাতকে প্রশ্ন করলেন, "এ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত তো প্রভাত বাবু?"

-"একদম। পুরোপুরি নিশ্চিত, একশো ভাগেরও বেশি" প্রভাত উত্তর দেয়।

–"ইনি কবে রেক্সর ফোর থেকে ফিরেছেন?"

–"সপ্তাহ খানেক আগে।"

–"আর এই পরিবর্তন গুলো তারপর সঙ্গে সঙ্গেই নজরে আসে?"

–"ইনি ফেরার পর প্রথম দেখাতেই এনার স্ত্রী ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন। এই ব্যাপারটা যে রেক্সর ফোরেই ঘটেছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।" একটু থেমে তারপর আবার বলে, "আর আপনি নিশ্চয়ই এর মানেটা বুঝতে পারছেন।"

–"হুমম্। বুঝলাম।" দিবাকর সোম খুব আস্তে আস্তে যেভাবে ফেলে রাখা মড়ির চারপাশে পাক খায় কোনও বাঘ তেমনি করে বসে থাকা যতীন দত্তের চারদিকে গোল করে হাঁটছেন। তীক্ষ্ণ নজরে পোষাকের ভেতরে থাকা যতীন দত্তের শরীরের দিকে প্রায় পলকহীন চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নজর করে চলেন।

যতীন দত্ত শান্ত ভাবে ওকে যে চেয়ারটা বসতে দেওয়া হয়েছে সেই চেয়ারটায় চুপ করে বসে থাকে। পাঞ্জাবীর নীচের ঝুলটা হাঁটুর উপর ভালো করে গুছিয়ে তুলে রাখে যতীন। হাত দুটো জড়ো করে গজদন্ত মুঠো ওয়ালা ছড়িটার উপর রেখে তাতে যেন শরীরের ভর দিয়ে রেখেছে। মুখে প্রশান্তির আভাস এবং নির্বিকার একটা ভাবও দেখা যাচ্ছে। সবুজ পাঞ্জাবীর সাথে একটা সাধারন ঘিয়ে রং-এর পাজামা। গলায় একটা শান্তিনিকেতনি কায়দার উড়নী জড়িয়ে রাখা যার একটা প্রান্ত বুকের সামনে দিয়ে নেমে কোলের ওপরে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দিবাকর সোমের দিকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া ও কিন্তু মুখে কোনো কথাই বলে না।

–"এদের কায়দা-কানুন কিন্তু একদম সরল আর যথাযথ," দিবাকর বলেন, "আসল আত্মাটিকে শরীর থেকে বার করে সেটাকে অন্য কোথাও জমিয়ে রেখে দেয় – একটা ভাসমান অবস্থায় – ত্রিশঙ্কুর মতো আর কি! পরিবর্তে যে আত্মাটিকে খালি করা শরীরে প্রবেশ করানো হবে সেটা আগে থেকেই তৈরি থাকে আর তৎক্ষণাৎ সেটা খালি হওয়া শরীরটায় ঢুকে পড়ে। যতীন দত্ত সম্ভবত নিরাপত্তা সম্বধিত কোনোরকম সাবধানতা না

নিয়ে – মানে কোনোরকম বর্ম বা ব্যক্তিগত আবরনী ব্যবহার না করে রেক্সর ফোরের পুরনো শহর গুলোর ধ্বংসস্তুপ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলো – আর এরা ঐ সময়ে কোনও ভাবে ওখানেই যতীনকে ধরে ফেলে।"

চেয়ারে বসে থাকা যতীন দত্ত এবার একটু নড়েচড়ে বসে। বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "আমি একবার মৃন্ময়ীর সাথে কথা বলতে চাই। অনেক দেরি হয়ে গেল। ও নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।"

প্রভাত মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তীব্র ঘেন্নায় ও মুখ বেঁকিয়ে বলে, "ওফ্। এ-টা তো এখনও নাটক করে যাচ্ছে!"

নির্দেশক দিবাকর সোম বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, "এটা নিশ্চিত একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। কোনো শারীরিক পরিবর্তন নেই। যে ভাবেই এটাকে পরীক্ষা করা হোক কোনো শারীরিক পরিবর্তন কেউই দেখাতে পারবে না। অথচ –", তিনি এবার কয়েক পা এগিয়ে গেলেন সামনে বসে থাকা

লোকটার দিকে। একটু ঝুঁকে পাথরের মত শক্ত মুখভঙ্গি করে সামনের বসে থাকা লোকটিকে কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

“এই যে, রেক্সোরিয়ান বাবু, সে তোমরা নিজেদেরকে যা খুশি বলেই ডাকো না কেন, এখন মনোযোগ দিয়ে একটু শোনো দেখি আমার কথা, আমি যা যা বলছি তুমি তা বুঝতে পারছো তো?”

–“একদম। না বোঝার কি আছে?”, যতীন দত্ত উত্তর দেয়।

–“তুমি কি সত্যিই ভাবছিলে এই ভাবে পার পেয়ে যাবে? তোমার আগে যারাই এই চেষ্টা করেছে আমরা তাদের সব্বাইকে ধরে ফেলতে পেরেছি। প্রত্যেককে। দশ – দশ জন ছিলো। এরা সবকটাই ধরা পড়েছে। এমনকি এই পৃথিবীতে পৌছোনোর আগেই।” শীতল কঠিন গলায় দিবাকর দাঁত কড়মড় করে এবার বললেন, “আর তারপর সব কটাকেই স্পন্দন রশ্মি দিয়ে একের পর এক ... ”

যতীন দত্ত তাকিয়ে থাকে। ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। কপালে জমেছে ফোটা ফোটা ঘামের দানা। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে নিয়ে বিড়বিড় করে অস্ফুটে বলে, “অ্যা?”

–“তোমরা আমাদের বোকা বানাতে পারবে না। গোটা পৃথিবী আর যত উপগ্রহ আমাদের আছে সব জায়গায় তোমাদের মতো রেক্সোরিয়ানদের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেই রাখা আছে। আমার তো আশ্চর্য লাগছে যে তুমি রেক্সর ছেড়ে বেরোতে পারলে কী করে! দত্ত নিশ্চিত কোনও বাজে ধরনের বোকামি কিছু একটা করেছিলো। এর আগে আমরা তো মাঝপথেই সবকটা মহাকাশযান আটকে তল্লাশি চালিয়ে তোমাদের দশ জন রেক্সোরিয়ানদের পাকড়ে স্পন্দন রশ্মি দিয়ে বহির্মহাবিশ্বে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। তো কথা হচ্ছে তুমি এখানে এসে ঢুকলে কী করে! সেটা একটু ব্যাখ্যা করবে?”

–“রেক্সর যাওয়ার জন্য যতীন দত্ত ব্যাক্তিগত জাহাজ ব্যবহার করেছিল, বসে থাকা লোকটা অস্ফুটে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, “তাই ও সবকটা পাহারাদারির দলকেই এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। রেক্সর ফোরের ছাড়পত্র

কেন্দ্রেও ওর প্রবেশ বা প্রস্থান – কোনোটাই তালিকাভুক্ত হয় নি। রেক্সরে যে যতীন দত্ত গিয়েছিলো সেটার কোন নথিও লিপিবদ্ধ হয়নি।”

এরপর আর কোন সংশয় থাকতে পারে না, নির্দেশক দিবাকর সোম নির্দেশ দিলেন তার বাহিনীকে “জ্বালিয়ে দাও এটাকে!”

তিন জন কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র প্রতিনিধি তাদের হাতের স্পন্দন নল উঁচিয়ে এগিয়ে আসে।

–“না” , মাথা নেড়ে বাধা দেয় প্রভাত, “উহু। আমরা এটা করতে পারি না। ঝামেলা হয়ে যাবে।”

–“কেন? কী বলতে চাইছেন আপনি? কেন পারবো না আমরা? এর আগেও গোটা দশেক রেক্সোরিয়ানকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি।”

–“ওগুলো ধরা পড়েছিলো মহাশুন্যে। এই পৃথিবীর মাটিতে না। এখানে মহাকাশ সামরিক আইন চলবে না। তাছাড়া – ”, ইঙ্গিতে প্রভাত বসে থাকা লোকটাকে এবার দেখায়, বলে, “আর এটার তো এখন মানুষের শরীর। তাই নাগরিক আইনের মাধ্যমেই এটার বিচার এখানে করতে হবে। জাতীয় বিচারালয়ে আমাদেরকেই

প্রমাণ করতে হবে যে এটা যতীন দত্ত নয় – এটা একটা রেক্সোরিয়ান অনুপ্রবেশকারী। যদিও কাজটা একটু কঠিন হবে – তবে সেটাও করে ফেলা যাবে।”

–“কী ভাবে?”

–“এর . . . ইয়ে, মানে, যতীন দত্তের স্ত্রী–র স্বীকারোক্তির সাহায্যে। মৃন্ময়ী দত্তের স্বীকারোক্তি নিঃসংশয়ে আমাদের যতীন দত্ত আর এটার মধ্যে পার্থক্য আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। মৃন্ময়ী দত্ত-ই এ ব্যাপারে একমাত্র প্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সে গোটা ব্যাপারটা নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানে। তাই বিচারালয়ে আমরা এটা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো। মানে মৃন্ময়ী দত্ত পারবে।”

সাত

মৃন্ময়ী এবং প্রভাত

দুপুর গড়িয়ে এখন সময় বিকেলের মাঝামাঝি। প্রভাত ওর ব্যক্তিগত সড়ক বাহনটা চালাচ্ছিলো খুব আস্তে আস্তে। পথে অবশ্য ভীড় তেমন কিছু নেই। আজকাল খুব কম লোকই সড়ক বাহন ব্যবহার করে। বেশিরভাগ মানুষ শুধু পায়ে হেঁটে চলাফেরার জন্য সড়ক পথ ব্যবহার করে। আকাশ বাহনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ায় সময় এবং পরিশ্রম অনেক কম খরচের। প্রভাত অবশ্য এখনও কোনও আকাশ

বাহন কিনে উঠতে পারেনি। অগত্যা এই সড়ক বাহন। সঙ্গে মৃন্ময়ী যাত্রী–আসনে পাশে বসে আছে। প্রভাত বা মৃন্ময়ী কেউই এতক্ষণ কথা বলছিলো না।

নীরবতা ভেঙ্গে শেষে মৃন্ময়ী বললো, “তো! এই হচ্ছে ব্যাপার!” ওর মুখ দেখে খুবই বিষন্ন মনে হচ্ছে। ক্লান্তিতে মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। দুপুরে যতীন আর প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ওর খাওয়া হয়নি। সারাক্ষন দুশ্চিন্তার মধ্যে কোনও রকমে শুধু গোলুকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। আর এখন তো এই ব্যাপার। প্রভাত দেখে দিদির চোখ দুটো এখনও শুকনো অথচ উজ্জ্বল. যদিও আবেগহীন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও আবার বলে, “আমি জানতাম এতোটা ভালো আমার জন্য কখনও সত্যি হতে পারে না।” ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে। হাসিটায় বিষন্নতা ভরা। বলে, “এই কদিন মনে হচ্ছিলো জীবন কতই না আনন্দের!”

–“আমি বুঝতে পারছি দিদি,” প্রভাত বাহনটা চালাতে চালাতে বলে, “এটা একটা খুবই ভয়ানক বাজে জিনিস হয়েছে। শুধু যদি এবার – ”

–“কেন?”, মৃন্ময়ী বলে, “কেন ও – মানে কেন ও’ টা এরকম করলো? কেন ও’ টা যতীনের শরীর দখল করলো?”

–“রেক্সর ফোর গ্রহটা আসলে অতি প্রাচীন। এখন তো প্রায় মৃত। জল পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রহটা তাই মরে যাচ্ছে। জীবন ওখানে শেষ – প্রায় সম্পূর্ণ মৃত। এই অল্প কিছু প্রাণ ছাড়া।”

–“হুম। আমার মনে পড়ছে, ও – ও রকমই কিছু একটা বলছিলো। প্রথম দিনই। রেক্সরের সমন্ধেই। যে ওখান থেকে চলে আসতে পেরে বেঁচেছে।”

–“রেক্সরোনিয়ানরা বহু প্রাচীন জাতি। আমাদের হিসেবে ডাইনোসরদের সমকালীন। এখন অবশ্য যে কটা টিকে আছে সেগুলো শারীরিক দিক দিয়ে খুবই দূর্বল। বহু শতাব্দী ধরেই এরা অন্য বাসযোগ্য গ্রহের খোঁজ করে চলেছে। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে এরা ততটা শক্তিশালী নয় – কখোনই ছিল না। এদের কয়েকটা দল শুক্র আর মঙ্গলে নেমেছিল। কিন্তু টিকতে পারে নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়েছিল। প্রায় এক শতাব্দী আগে এরা আমাদের সৌরজগতের খোঁজ পায়। পৃথিবীতে আগে থেকেই আমরা থাকায় আর নিজেরা শারীরিক ভাবে দূর্বল হওয়ায় এরা পৃথিবীতে নামার চেষ্টা করে নি কখনও। এদের বিজ্ঞান কখনও অস্ত্র শস্ত্র বানাতে পারে নি বা হয়তো চেষ্টা করে নি। খুবই নিরীহ ধরনের জীব ছিল এরা। এদের যা কিছু সবই চিন্তাশক্তির মাধ্যমে।”

–“কিন্তু এরা তো যা দেখছি অনেক কিছুই জানে। আমাদের সমন্ধে। এমনকি এটা আমাদের ভাষাতে কথাও বলতে পারে!”

–“পুরোপুরি না। খেয়াল করে দ্যাখ তুই যে যে পরিবর্তনগুলো ধরেছিলিস। বললি না কেমন যেন পুরোনো দিনের মতো কথাবার্তা। মনে পড়ছে? আসলে কী জানিস? আমাদের মানব সভ্যতার সমন্ধে এই

রেক্সরোনিয়ানরা যা কিছু জানে তা সবই ভাসা ভাসা। একধরনের সংক্ষিপ্তসার বা হেডপিস। মানে, ধর, আমি তোকে বললাম যে মহাভারত হচ্ছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প – কিন্তু সেটাই কি সব? আসলে পৃথিবী আর কৃত্রিম উপগ্রহ বা আন্তর্নক্ষত্র প্রোব গুলোর মধ্যে যে সব রেডিও বার্তা – যা কিছু এরা ধরতে পেরেছে – তার মধ্যে দিয়েই যতটুকু যা জানতে পেরেছে। বেশিরভাগই দ্বিতীয় ধাপের তথ্য। আর তাই দিয়ে বোঝার চেষ্টা। এছাড়া মানব সভ্যতার সম্পর্কে এই রেক্সোরিয়ানদের জ্ঞান ভান্ডার প্রধানত আমাদের সাহিত্য নির্ভর। তাও প্রাচীন সাহিত্য। ইতিহাসে তো পড়েছিস, যখন আমরা মহাকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না সেই সময় এদের কিছু প্রাণ এক ধরনের মহাকাশযান ব্যবহার করে চুপি চুপি পৃথিবীতে আসতো। এসে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। তুই ছোটবেলায় সেই ইউএফও-র গল্প শুনিয়েছিলিস মনে আছে? এরাই আসতো তখন। যত রাজ্যের আমাদের সাহিত্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল এরা। গুচ্ছ গুচ্ছ সব প্রাচীন রোমান্টিক সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস, আমাদের ভাষাতত্ব – এই সব। ফলিত বিজ্ঞান এদের পছন্দের জিনিস ছিল না মনে হয়।” সামনের ট্রাফিক সংযোগস্থলে লালবাতিতে দাঁড়াতে হলো। বাতি সবুজ

হতেই প্রভাত বাহন চালু করে বলত শুরু করলো, "সেই জন্যই তুই হয়তো যতীন দত্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচীন ব্যবহার লক্ষ্য করতে পেরেছিলিস। এরা আমাদের সভ্যতার সম্পর্কে জেনেছে ঠিকই কিন্তু একদিকে সেটা হয়েছে দ্বিতীয় স্তরের তথ্যের মাধ্যমে আর অন্য দিকে পেয়েছে শুধু প্রাচীন তথ্য। তাছাড়া এরা সভ্যতার যান্ত্রিক বিকাশের দিক দিয়েও অন্তত দুশো-পাঁচশো বছর পিছিয়ে আছে আমাদের চেয়ে – আর এটাই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারছি।"

মৃন্ময়ী চিন্তা করছিলো। অভ্যাস মতো ও কপালে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলে উঠল, "আচ্ছা, এ ধরনের ঘটনা ঘটা কী সাধারণ ব্যাপার? মানে হয়েই থাকে? আমার তো এ এক অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। যেন স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বাস করাই কঠিন যে এরকম একটা কিছু আসলে আমার সঙ্গেই ঘটে গিয়েছে। আমি এখনও এটা বোঝার চেষ্টা করছি যে এই সব ঘটনার প্রকৃত অর্থ কী? উদ্দেশ্য কী? "

–"দ্যাখ দিদি, তুই নিশ্চই জানিস যে এই মহাবিশ্বে প্রকৃতপক্ষে গিজগিজ করছে অসংখ্য প্রাণ – আর এই মহাজাগতিক প্রাণেরা আবার বিভিন্ন ধরনের এবং রকমের। কিছু নিরাপদ আর কিছু ভয়ংকর। যেগুলো নিরাপদ সেগুলোর কাছে আমরা আবার ভয়ংকর। উল্টোদিকে আবার ভয়ংকরদের কাছে আমরা হলাম নিরাপদ। কেউই কিন্তু আমাদের পার্থিব সভ্যতার জন্য দয়াপরবশ নয়। প্রত্যেকেই শিকারী। অপেক্ষা করছে শিকারের। যে সভ্যতা আগে আঘাত হানতে পারবে সে বেঁচে যাবে আর যে পারবে না সেই সভ্যতা মুছে যাবে মহাবিশ্বের বুক থেকে। মোটকথা আমাদের সবসময়ই সজাগ থাকতে হবে – নিজেদের রক্ষা করতে হবে যে কোনও রকম শিকারীর থেকে। আর যতীনদা হয়তো এখানেই কিছু ভুল করে ফেলেছিল। কোনও রকম সাবধানতা না নিয়ে রেক্সরে ঢুকে পড়েছিল আর এ' টা সেই সুযোগে যতীনদার শরীরটা দখল করে নেয়।"

প্রভাত ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দিদির দিকে তাকায়। মৃন্ময়ীর মুখটা এখন কঠিন হয়ে আছে, দীঘল চোখ স্থির – কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে নি। এটা দেখে প্রভাত নিশ্চিত হয়। বড়ো বড়ো চোখ দুটো সামনের পথের উপর রেখে সোজা হয়ে বসে আছে দিদি। হাত দুটো কোলের উপর জড়ো করে রাখা। দিদির জন্য মায়ায় বুকটা ভরে

ওঠে প্রভাতের। মা হঠাৎই মারা যাওয়ার পর বাবা কেমন যেন তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। দিদি তখনও ভাষাতত্ব নিয়ে মাস্টার্স করছিলো আর ও সবে কলেজে ঢুকেছে। কোনও এক বন্ধুর মারফৎ যতীন দত্তের সঙ্গে বিয়ের এই সমন্ধটা পেয়ে বাবা আর দেরি করতে চান নি। ডিআরডিও-র তরুণ বৈজ্ঞানিক তখন যতীনদা। দিদির অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়েটা হয়ে গেলো। আর তারপর তো ও নিজে কলেজ থেকে বেরোনোর আগেই বাবাও চলে গেলেন। বিনতাও বেশি দিন রইলো না। পৃথিবীতে নিজের বলতে তার এই দিদিটা আর গোলু ছাড়া আর কেউই নেই।

প্রভাত ডাকে, "দিদি?", মৃন্ময়ী তাকায় না দেখে হাত বাড়িয়ে প্রভাত দিদির হাতটা ছোঁয় একবার। তারপর বলে, "দ্যাখ, তুই চাইলে ব্যাবস্থা করা যাবে যাতে তোকে কোর্টে না যেতে হয়। একটা ভিডিও-তে তোর বক্তব্য রেকর্ড করে নিলেই চলবে। ওটাই কোর্ট প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবে। সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তাছাড়া এখনকার যিনি নির্দেশক, উনি আমার পূর্ব পরিচিত। কাজেই অসুবিধা হবে না। শুধু তুই তোর একটা বক্তব্য আজ নির্দশকের উপস্থিতিতে রেকর্ড করিয়ে নে। আমি সব ব্যাবস্থা করেই রেখেছি। একটা প্রমাণ না দেখাতে পারলে কোর্টে তো কেসটা দাঁড় করানো যাবে না। তবে তোর সাক্ষ্য পেলেই হয়ে যাবে। ওটাই এই কেসে আমাদের মোক্ষম অস্ত্র।"

মৃন্ময়ী কোনও উত্তর দেয় না। একবার শুধু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়।

প্রভাত প্রশ্ন করে, "তুই কি বলিস?"

-"আমি কিছুই বলছি না। আগে বল, কোর্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কি হবে?"

-"তখন আমরা ওটার উপর স্পন্দন রশ্মির প্রয়োগ করবো। যতীনদার শরীর থেকে ঐ রেক্সোরিয়ান আত্মাটাকে বের করে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারপর আমাদের মহাকাশ রক্ষী বাহিনীর টহলদার জাহাজ রেক্সর ফোরে একটা সন্ধানী দল নামাবে, যারা যতীনদার – ইয়ে, মানে আসল আত্মাটাকে খুঁজে নিয়ে আসবে।"

মৃন্ময়ী একটা হাঁফ ছেড়ে ভাইয়ের দিকে ঘুরে বসে। ওর মুখে চোখে উত্তেজনা স্পষ্ট বোঝা যায় এবার। বলে, "মানে, তুই বলছিস -"

-"আরে হ্যাঁ। যতীনদা বেঁচে আছে। যদিও একটা ভাসমান মধ্যবর্তী অবস্থায় – ত্রিশঙ্কুর মতো খানিকটা বলতে পারিস। ঐ রেক্সর ফোরেই কোথাও। ওখানকার কোনও না কোনও একটা শুকিয়ে যাওয়া শহরের ধ্বংসস্তুপে। আমাদের বাহিনী বলপ্রয়োগ করে বা যেভাবে হোক রেক্সোরিয়ানদের বাধ্য করবে যতীনদার আত্মাকে খুঁজে এনে হস্তান্তরিত করার জন্য। ওরা হয়তো সহজে মানবে না। তবে শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হবে। আগেও এরকম বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারনে ওদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের বাহিনী এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ আর দক্ষ। তুই চিন্তা করিস না। তারপর তোর যতীনদা আবার তোর কাছে। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিরাপদ। একদম আবার আগের মতো। আর তোর এই দুঃস্বপ্নের দিন শেষ হয়ে যাবে।" - "হুমম্। আচ্ছা।"

-"এই যে আমরা পৌঁছে গিয়েছি।" প্রভাত ওর সড়ক বাহনটা কে বাঁক খাইয়ে বিশাল আন্তর্নক্ষত্র নাগরিকত্ব কমিশনের ছাড়পত্র বিভাগের অফিস বাড়িটার পার্কিং লটে দাঁড় করায়। তাড়াতাড়ি করে নেমে এসে যাত্রী আসনের দিকের দরজাটা খুলে ধরে। মৃন্ময়ী ধীরে সুস্থ নেমে আসে।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, "তুই ঠিক আছিস তো?"

-"একদম।" মৃন্ময়ীকে অস্বাভাবিক নিশ্চিত মনে হয় প্রভাতে।

আট

ছাড়পত্র কমিশন এবং মৃন্ময়ী

মৃন্ময়ীকে নিয়ে প্রভাত অফিস বাড়িটার ভেতরে ঢোকার পর ছাড়পত্র প্রতিনিধিরা ওদের পরিসন্ধান যন্ত্রের পর্দার মধ্যে দিয়ে পার করিয়ে ভেতরের লম্বা একটা করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। ফাঁকা করিডরে মৃন্ময়ীর হাই হীল জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে নিস্তবদ্ধতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছিল বারবার।

প্রভাত বললো, "কেমন জায়গাটা?"

-"ভালো না। মনে হচ্ছে শত্রুপুরী।"

-"দূর! তবে তুই এটাকে একটা উচ্চস্তরীয় পুলিশ থানা বলতে পারিস।"

একটা দরজার সামনে পৌঁছে এবার প্রভাত দাঁড়াল। সামনে দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

-"এসে গেছি।" প্রভাত ঘোষণা করে।

-"দাঁড়া একটু," মৃন্ময়ী এক পা পিছিয়ে আসে, এতক্ষণে যেন ভয়ের একটা ছাপ পরেছে ওর মুখ চোখে। বলে, "আ.. আমি - "

প্রভাত দিদির পিঠে হাত দিয়ে ভরসা দেয়। বলে, "ঠিক আছে। কোনো ব্যাপার না। তুই সামলে ওঠা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো," ইশারায় সঙ্গের ছাড়পত্র প্রতিনিধিদের চলে যেতে বলে। প্রতিনিধি শ্রবণসীমার বাইরে চলে যাওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করে। তারপর পরে আবার বলে, "আমি মানছি এটা একটা কঠিন সময় তোর জন্যে।"

মৃন্ময়ী কয়েক মূহুর্ত নীচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন পায়ের আঙ্গুল গুলো পরীক্ষা করছে। একটু পরে নাভিমূল থেকে একটা গভীর লম্বা শ্বাস নিয়ে দু হাতের আঙ্গুলগুলো শক্ত করে মুঠো পাকিয়ে ধরে।

তারপর মাথা তোলে। চিবুক দৃঢ় এবং সোজা। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভাইয়ের দিকে না তাকিয়েই বলে, "ঠিক আছে, এবার চল।"

-"তুই তৈরি?"

-"হ্যাঁ।"

প্রভাত দরজার পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রথমে দিদিকে ঢুকতে দেয়। তারপর নিজে ভেতরে পা রেখে ঘোষণা করে, "আমরা এসে গিয়েছি।"

নির্দেশক দিবাকর সোম আর সঙ্গের তিনজন ছাড়পত্র প্রতিনিধি ঘুরে দাঁড়ায়। ওরা সবাই ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। দিবাকর বললেন, "যাক পৌঁছেছেন আপনারা তাহলে! ভালো। আমার তো চিন্তা হচ্ছিল যে আপনারা কখন এসে পৌছোতে পারবেন।"

মৃন্ময়ী দের ঢুকতে দেখে ওদিকে বসে থাকা লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। আলতো হাতে পড়নের পাঞ্জাবীটা ঝেড়ে নেয় একটু। তারপর গজদন্তের মুঠো-ওয়ালা ছড়িটা শক্ত করে চেপে ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝা যায় ওর হাত একটু একটু কাঁপছে উত্তেজনায়। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে দরজা দিয়ে এই মাত্র ঢুকে আসা মহিলার দিকে। মহিলার ঠিক পেছনেই প্রভাত।

প্রভাত এবার দিবাকর সোমের সাথে দিদির পরিচয় করিয়ে দেয় "সোম সাহেব, ইনি আমার দিদি, মিসেস দত্ত। আর দিদি, ইনি হচ্ছেন আন্তর্নক্ষত্র নাগরিকত্ব কমিশনের ছাড়পত্র বিভাগের আঞ্চলিক নির্দেশক - দিবাকর সোম।"

মৃন্ময়ী মৃদু স্বরে বলে, "আমি আপনার কথা শুনেছি।"

-"তবে তো আপনি আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন।"

-"হ্যাঁ। আমি আপনাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানি।"

-"দেখুন, অবশ্যই এটা একটা দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যদিও এরকমটা একদম নতুন ঘটনা নয়। আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমি জানি না ছাড়পত্র আইনজীবী প্রভাত আপনাকে কতোটা কী জানিয়েছেন - "

-"প্রভাত আমার ভাই। ও আমাকে গোটা বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলেছে।"

-"যাক, ভালো হলো," দিবাকর সোম হাঁফ ছাড়েন। "এতে সুবিধা হলো এই যে আর নতুন করে আমাকে পটভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হবে না। ওটা সোজা ব্যাপার নয়। আপনি যখন পুরো ব্যাপারটা শুনেছেন, বুঝেছেন, তো এটাও নিশ্চই জানেন যে আমরা ঠিক কী করতে চাইছি। আসলে বাকি সব অন্য ঘটনা গুলো

ধরা পড়েছে মহাকাশের গভীরে। আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই স্পন্দন রশ্মির ব্যবহার করেছি আর তারপর প্রকৃত আত্মাগুলোকে ফিরিয়ে এনেছি। মহাকাশের গভীরে হওয়ার ফলে আমাদের সামরিক আইন ব্যবহার করতে আর জোর খাটাতে কোন বাঁধা পেতে হয় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের পার্থিব নাগরিক আইনের মধ্যে দিয়ে কাজটা করতে হবে। আর সেজন্যই আপনার সাহায্য প্রয়োজন।"

দিবাকর একজন প্রতিনিধিকে ইশারা করতেই সে একটা ভিডিও ক্যামেরা আর মাইক মৃন্ময়ীর সামনে রেখে গেলো।

দিবাকর সোম বললেন, "মিসেস দত্ত, আমরা আপনার সম্পূর্ণ বক্তব্যটা ভিডিও রেকর্ড করবো। যেহেতু কোনও শারীরিক পরিবর্তন এখনো পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নি সেইজন্য আমাদের হাতে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এই কেসটা নিয়ে এগোনোর জন্য। কোর্টে পেশ করার জন্য আমাদের হাতে থাকবে শুধু একজন স্ত্রী

হিসেবে কাছ থেকে আপনি স্বচক্ষে যা যা চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তার রেকর্ডেড ভিডিও স্বীকারোক্তি। এটাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে কোর্টে পেশ করা হবে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে?"

দিবাকর সোম এবার ক্যামেরা চালু করলেন। তারপর মাইকটা এগিয়ে দিলেন মৃন্ময়ীর হাতে। মৃন্ময়ী হাত বাড়িয়ে আস্তে করে মাইকটা তুলে নেয়। চোখ তুলে তাকায় ছাড়পত্র নির্দেশকের দিকে। কিছু না বলে চুপ করে তাকিয়ে থাকে মৃন্ময়ী।

দিবাকর বলেন, "আপনার বক্তব্য নিঃসন্দেহে কোর্টে গৃহীত হবে। কোনো আইনগত বাধা উঠতে পারবে না। কারন ঐ যে বললাম – যেহেতু কোনও শারীরিক পরিবর্তন এখনো পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নি তাই স্ত্রী হিসেবে কাছ থেকে আপনি স্বচক্ষে যা যা চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তার রেকর্ডেড ভিডিও স্বীকারোক্তি ভিত্তিতেই আমরা আমাদের পক্ষে কোর্টের রায় পেয়ে যাবো। যদি এই সবকিছু আমরা যেমন যেমন ভাবছি ঠিক সেইরকম ভাবে ঠিকমত ঘটে তো আমরা আশা রাখি যে সবকিছু খুব শীঘ্রই আবার আগের মতো যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে দিতে পারবো।"

মৃন্ময়ী ইতিমধ্যে চোখ সরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলো কোনের দিকে একটা চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, হাতে গজদন্ত মুঠো ওয়ালা ছড়ি হাতে সবুজ পাঞ্জাবী পরিহিত লোকটার দিকে। এবার দিবাকর সোম চুপ করলে চোখের নজর না সরিয়েই মৃন্ময়ী জানতে চায়, "আগের মতো? তার মানে?"

–"পরিবর্তনের আগের মতো।"

এবার মৃন্ময়ী ঘুরে দাঁড়ায় নির্দেশক দিবাকর সোম এর দিকে। শান্ত ভাবে হাতের মাইকটা নামিয়ে রাখে সামনের টেবিলের উপর। তারপর ধীর স্বরে জানতে চায়, "আপনি কোন পরিবর্তনের কথা বলছেন?"

দিবাকর সোম এর মুখে একটা বিবর্ণ ভাব জেগে ওঠে। উনি একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেন। ঘরটার ভিতরে উপস্থিত সকলের চোখ তখন মৃন্ময়ীর উপর। আঙ্গুল দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে দিবাকর সোম বলেন, "ঐ ওর পরিবর্তনের কথা বলছি আমি।"

প্রভাত একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চীৎকার করে ওঠে, "দিদি! কী হলো কি তোর?", ছুটে আসে ও মৃন্ময়ীর কাছে। – "তুই কি করছিস কি দিদি? তুই ভালো করেই জানিস কার কোন পরিবর্তনের কথা আমরা বলছি!"

–"সেটাই তো অদ্ভুত!", মৃন্ময়ী চিন্তাগ্রস্ত ভাবে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি তো কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি!"

প্রভাত আর দিবাকর সোম পরষ্পরের দিকে হতবাক হয়ে তাকায়। বিস্মিত প্রভাত বিড়বিড় করে বলে, "আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না!"

–"মিসেস দত্ত – ", দিবাকর সোম কিছু বলার চেষ্টা করেন।

মৃন্ময়ী ততক্ষণে ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ঘরের কোণের দিকে। যে লোকটা নির্বাক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছে। এবার হাত বাড়িয়ে লোকটার একটা হাত ধরে নিয়ে মৃন্ময়ী বলে, "চলো, আমরা এবার যাই।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় মৃন্ময়ী, "না কি, আরো কিছু কারন আছে যে তার জন্যে আমার স্বামীকে এখানে আরও অপেক্ষা করতে হবে?"

নবম অধ্যায়

আমি চিনি গো তোমায় চিনি

সন্ধ্যা নেমে আসা অন্ধকার পথে একজন নারী এবং একজন পুরুষ হেঁটে যাচ্ছিলো।

মৃন্ময়ী বললো, “চলো, এবার আমরা ঘরে ফিরি।”

পুরুষটি তার দিকে তাকায়, বলে, “এই গোধূলি লগ্নটা কিন্তু খুব সুন্দর।”

সে একটা লম্বা, গভীর শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ ফুসফুসে পারলো হাওয়া টেনে নিতে থাকলো। তারপর বললো, “আমার মনে হচ্ছে বসন্ত আসছে – তাই না?”

মৃন্ময়ী মাথা নাড়ে। ও জানে না। অনেক দিন হলো ও ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্কে উদাসীন।

–“আমিও জানি না। কিন্তু এই যে হওয়াতে এত রকমের গন্ধ ভেসে আসছে – গাছের গন্ধ, মাটির গন্ধ, ফুল-পাতার গন্ধ – এই গন্ধটুকু নেওয়ার জন্যেই তো বেঁচে থাকা। বলো? ”

–“হ্যাঁ।” মৃন্ময়ী উত্তর দেয় বটে, কিন্তু ওকে চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। কোনও এক গভীর ভাবনার ভেতরে ও যেন ভেসে যাচ্ছে।

–“আমরা কি হেঁটে হেঁটে যাবো? বাড়িটা খুব দূর হবে কী?”

–“না। খুব বেশি দূর নয়। আমরা শর্টকাট ধরে নেব।”

অনেকক্ষণ দুজন নীরবে হেঁটে চলে। একজন পুরুষ আর একজন নারী। আশপাশ দিয়ে আরো আরো মানুষজন, সড়ক বাহন চলে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বাতাস বইছে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি চোখ তুলে গভীর ভাবে তার সঙ্গিনীর দিকে তাকায়। তার চোখে মুখে একটা গম্ভীর ভাব, যেন গুরুতর কিছু বিষয়ে কিছু বলার আছে। “আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার এই দান আমি কোনো দিনই ভুলবো না।”

মৃন্ময়ী শুধু মাথা নাড়ে। কোনও উত্তর দেয় না।

–“ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করার মতো আমার অধিকার নেই। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি – ”

মৃন্ময়ী হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ায়। “তোমার নাম কী? মানে, তোমার আসল নাম?”

পুরুষটি চোখ কুঁচকে হাসে। একটা মৃদু, নরম, শান্ত হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, “নাম? আমার মনে হয় না তুমি ওটা উচ্চারণ করতে পারবে। ওটা ঠিক শব্দ দিয়ে তৈরি নয়। কয়েকটা বিভিন্ন মাত্রার কম্পনের তরঙ্গ দিয়ে – ”

মৃন্ময়ী চুপ করে যায়। সামনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। ওকে গভীর চিন্তায় মগ্ন মনে হয়। পুরুষটি চুপচাপ নীরবে মৃন্ময়ীর পাশে পাশে চলতে থাকে।

ক্রমে শহরের আলো চারদিকে জ্বলে উঠতে থাকে। উজ্জ্বল হলুদ রং-এর আলোর বিন্দু সব চরাচরে এক এক করে ফুটে ওঠে। ফুটে উঠে চারিদিক থেকে ক্রমশ ওদেরকে ঘিরে ধরে। তখনও ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

বেশ খানিকক্ষণ পর পুরুষটি আবার মুখ খোলে। প্রশ্ন করে, "তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। কী ভাবছো তুমি?"

-"ভাবছি আমি বোধহয় তোমাকে এখনও যতীন বলেই ডাকতে পারি," মৃন্ময়ী একটু থেমে আবার বলে, "যদি তোমার খারাপ না লাগে!"

পুরুষটি বলে, "খারাপ? কেন? আমার তো মনে হয় আমার ভালোই লাগবে" , এই বলে পুরুষটি হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীকে জড়িয়ে টেনে নিয়ে আসে নিজের কাছে। তারপর ক্রমশঃ ঘন হয়ে ওঠা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, দুপাশে জ্বলে ওঠা হলদে বিন্দুর মতো আলোকমালায় সজ্জিত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নরম চোখে সঙ্গিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে পুরুষটি তার নারীটিকে বলতে থাকে, "যা তোমার ভালো লাগে। যা তোমাকে সুখি করে তুলবে।"

"পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি,

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।

রঙিন নিমেষে ধুলার দুলাল

প্রানে ছড়ায়ে আবীর গুলাল,

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে

দিগঙ্গনার নৃত্য;

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে

ঝলমল করে চিত্ত।"

শিমুলগাঁওয়ের এক রাত

–সায়ন্তন সেনগুপ্ত

সনাতন যখন আমাদের লাল মোরাম বিছানো রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে গেল , তখন সূর্য্যের আলোয় বিকালের রং লেগেছে । মোটর ভ্যানের একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে দৃষ্টিপথের আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে গেল শিমুলগাঁও স্টেশন , আন্দাজ মতন আমাদের চেয়ে তিন - চারশো গজ দূরে । পান্ডব বর্জিত জনমানব শূন্য প্রান্তরে মানব সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন । মাঝের পথটুকু আমাদের পেরোতে হবে আল বেয়ে । দুপাশে ধান রোয়া হয়েছে, জলমগ্ন জমির মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে হাত খানেক উঁচু সারিবদ্ধ ধান গাছ । আলের শেষে লাল কাঁকুড়ে জমি আর তারপরই জনশূন্য দুটি প্ল্যাটফর্ম । রেললাইনের অপর প্রান্তে যে প্ল্যাটফর্ম, দূর থেকে তার ওপর দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে । মলিন হলুদের উপর কালো দিয়ে লেখা শিমুলগাঁও । তার পেছনে জলাজঙ্গল মতো জায়গাটার দিকে ভালো ভাবে দেখলে দেখা যায় লাল রংয়ের দুটো ঘর , সামনে কোমর সমান লোহার বেড়া । আরও পেছনে ঘন জঙ্গল, জঙ্গল বরাবর দৃষ্টিপথ এগোলে শেষমেষ চোখে পড়ে অনুচ্চ কিছু টিলা । লোকের সন্ধানে আমরা প্রথম উঁকি মারলাম নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মের ঘরগুলোতেই । প্রথমটার দরজা জানলা দুটোই বন্ধ , দরজায় তালা , পাশের জানলার নিচ থেকে বেড়িয়ে আসা ভাঙাচোরা সিমেন্টের স্ল্যাব দেখে অনুমান করলাম এটি টিকিট কাউন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হত। পাশের ঘরটি অবশ্য খোলা , আনুমানিক পনেরো বাই কুড়ি হবে , ঘরের তিনদিকে দেওয়াল বরাবর সিমেন্টের বেঞ্চ । দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালে একটা জানলা আর একটা ডানদিকের দেওয়ালে । বাঁদিকের দেওয়ালটা পাশের ঘরের সাথে কমন ।এই ঘরটি যাত্রীদের বসার জন্য বা ওয়েটিংরুম হিসাবে তৈরী হয়েছিল নিশ্চয়ই । আমাদের মধ্যে চোখে চোখে একটা ইশারা হয়ে গেল - এটাই হবে শিমুলগাঁওতে আমাদের রাত্রিযাপনের আস্তানা । মালপত্তর নামিয়ে , প্রলয় আর সৌমেনকে ওই ঘরে রেখে আমি বিজনকে নিয়ে চললাম প্ল্যাটফর্মের পিছনে প্রায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে থাকা লাল ঘরদুটির দিকে । আন্দাজ করেছিলাম ওটা স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার হবে । একটা পায়ে হাঁটা লাল সুরি পথ চলে গেছে ঘরদুটোর দিকে । দু-একবার হাঁকডাক করার পর বিজন আমার কাঁধে হাত রাখলো , দরজায় তালা ঝুলছে । আমরা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম । বিজন বলল , ' কোথাও গেছে নিশ্চয়ই । স্টেশন যখন আছে স্টেশন মাস্টারও নিশ্চয়ই আছে । '

'হুম , সনাতনও তো তাই বলল , ' স্টেশন মাস্টার ছাড়া আর কেউ থাকেনা । ' '

বিজনকে সমর্থন জানিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে ফেরা শুরু করলাম ।আকাশের আলো দ্রুত কমে আসছে । পরিত্যক্ত ওয়েটিং রুমে এসে দেখলাম প্রলয় আর সৌমেন কাজ শুরু করে দিয়েছে । ঘরটা ঝাঁট দিয়ে জল ছিটিয়ে মোটামুটি রাত্রিবাসের উপযোগী করে তুলেছে । প্রলয় ঘরের আসেপাশে একটা শিশি থেকে একটা তরল ছাড়ছে ,ওটা কারবলিক অ্যাসিড । যার সন্ধানে এসেছি তার দেখা পাই না পাই এই শেষ বর্ষায়

অন্য কোনো বিপদের আগমনের সম্ভাবনা প্রবল , তাই এই সাবধনতা অবলম্বন । অন্য দিকে সৌমেন প্লাস্টিকের ত্রিপল মাটিতে বিছিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বার করছে । দুটো ফুলচার্জড ইমার্জেন্সি

লাইট , দুটি হাই পাওয়ার স্টিলের টর্চ , কয়েকটা মোমবাতি , হাওয়া বালিশ , একটা ফার্স্টএড বক্স , দুটো চাদর , এক প্যাকেট তাস ইত্যাদি ইত্যাদি । খাবারের প্যাকেটটা একটু দূরে রাখা আছে । আমরা এসে ত্রিপলের উপর গুছিয়ে বসলাম । হাতের কাজ শেষ করে প্রলয়ও চলে এলো ।

গল্প আর এগোনোর আগে আসুন পাঠকদের সাথে একটু পরিচয় সেরে নেওয়া যাক ।আমি রুপ চৌধুরী ,উত্তর কলকাতার এক স্কুলের সায়েন্সের টিচার। বিজন ও সৌমেন আমার ছোটবেলার বন্ধু । বিজন আই.টি সেক্টরে আছে আর সৌমেনদের পারিবারিক ব্যবসা । আমরা তিনবন্ধু মাঝেমধ্যেই বেড়িয়ে পড়ি দল বেঁধে । তবে আমাদের বেড়িয়ে পরার একটা নির্দিষ্ট ঝোঁক আছে । গন্তব্যের সাথে যদি কোনো ভৌতিক কাহিনীর সংযোগ থাকে তাহলে সে স্থান আমাদের চুম্বকের মতন টানে । আমাদের বাকি বন্ধুরা আমাদের ত্রয়ীকে ভূত পর্যটক বলে ডাকে । আর আমাদের এবার ভূত পর্যটনের নিশানা শিমুলগাঁও স্টেশন । ইন্টারনেটে এক আর্টিকেলে এর সন্ধান মেলে । বাংলা ঝাড়খন্ড সীমান্তে এক ছোট্ট স্টেশন । বর্তমানে প্রায় অব্যবহৃত এই স্টেশন একসময়ে আসে পাশের বিশ বাইশটা গ্রামের ভরসা স্থল ছিল । বছর ছয়েক আগে থেকে নাকি ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয় । ক্রমে ক্রমে এই স্টেশন প্রায় পরিত্যক্ত । যদিও খাতায় কলমে স্টেশনটা উঠে যায়নি । বর্তমানে স্টেশনটি ভূতপ্রেমীদের আকর্ষণের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে । যদিও ঠিক কি ধরনের ভৌতিক কাণ্ডকারখানা এখানে হয় সে বিষয় পরিস্কার করে আর্টিকেলে কিছু লেখা ছিলোনা ।

আর্টিকেলটি পড়ার পরই আমাদের পরবর্তী ভূতাভিযানের গন্তব্য হিসাবে শিমুলগাঁওয়ের প্রস্তাব করি আমি । সৌমেন আর বিজন সানন্দে লুফে নিল এই প্রস্তাব। প্রলয় , আমার মাসতুতো ভাই , মাস্টার ডিগ্রির পরীক্ষার শেষে ছুটি কাটাতে এসেছিল আমাদের বাড়ি । সেও সোৎসাহে জুটে গেল ভূতাভিযানে । সময় কাটানোর জন্য ইমার্জেন্সি লাইট জ্বালিয়ে তাস নিয়ে আমরা বসলাম কলব্রে খেলতে । পাশে খবরের কাগজের উপর রাখা মুড়ি চানাচুরের । রাতের খাবার কতদূর খাওয়া যাবে জানি না ।তাই মুড়ির পুরো কৌটোটাই সৌমেন উল্টে দিয়েছে প্রায় । একটা ক্লান্তি আছে , তাই রুকস্যাকটায় হেলান দিয়েই কল করছি । আজ সকাল আটটায় এসে নেমেছি সদরে । সেখান থেকে শেয়ারের ম্যাজিকে মোহনপুরে । আসার পথে ম্যাজিকে আমাদের সহযাত্রী শুধু মানুষ নয়ে ছোটবড় মুরগী মায় ছাগলছানাও । আজ যে হাটবার তাই দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ রসদ সংগ্রহ করে চলেছে নিজ নিজ বাসায় । মোহনপুর থেকে অবশেষে সনাতনের ভ্যান ।

' কেউ আছেন ? '

মানুষের কন্ঠস্বরে যে চারজনই এমন চমকে উঠবো ভাবিনি । নিজেদের সামলে নিয়ে দেখলাম ঘরের দরজার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে । মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না । প্ল্যাটফর্মের একমাত্র লাইট বাইরে থাকায় তার লম্বা ছায়া এসে পড়েছে ভেতরে । বিজন গলা খাকরি দিয়ে বলল, ' আসুন । '

তার আগেই অবশ্য ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছেন । ইমার্জেন্সির আলোয় দেখলাম বয়স আমাদের মতই হবে । ঐ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ । রোগাটে চেহারা গালে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি । পরনে শার্ট প্যান্ট ।

' কোলকাতা ? '

' হ্যাঁ । ' প্রলয় উত্তর করল ।

আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের উত্তরে আগুন্তক নিজের পরিচয় দিলেন । নাম প্রদীপ বর্মণ , আদি বাড়ি দুর্গাপুর । বর্তমানে ছয়মাস ধরে ঠিকানা অবশ্য শিমুলগাঁও স্টেশন । পেশাগত পরিচয় স্টেশন মাস্টার , শিমুলগাঁও ।

পরিচয় পেয়ে বিজন ফ্লাস্কের চা ঢেলে এগিয়ে দিল প্রদীপ বাবুর উদ্দেশ্যে । যতই হোক আমরা বিনা অনুমতিতে একটা সরকারি প্রপার্টিতে আস্তানা গেড়েছি । তাই ওনাকে কে একটু খাতির করাই শ্রেয় মনে হল ।

আমাদের উপস্থিতিতে উনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হলনা । বরং কয়েকটা কথা বলার মানুষ পেয়েছেন বলে খুশিই হলেন যেন । এখানে এসেই ওনার খোঁজে গেছিলাম শুনে বললেন পাশের আদিবাসী গ্রামে গেছিলেন । হাটের দিন গ্রামের একজন প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে আসে ওনার জন্য , উনি গ্রামে গিয়ে সংগ্রহ করে নেন । চা মুড়ির সাথে সান্ধ্য আড্ডা এগিয়ে চলল । আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন , ভূতের কথা রটার পর তাও কিছু মানুষ আসে মাঝে সাঝে না হলে দিনে শুধু দুটো ট্রেন যায় । সকালে আর দুপুরে একটা একটা করে প্যাসেঞ্জার ট্রেন । অন্য সময় এ স্টেশনে মনুষ্য বর্জিত । '

'কেন আপনি ? আপনি কি তেনাদের দলে ? '

প্রলয়ের রসিকতাটা বুঝে হো হো করে হেসে উঠলো প্রদীপ বাবু ।

' আমি হতভাগ্য , একরকম পানিশমেন্ট পোস্টিং পেয়েছি বলতে পারেন । '

ভদ্রলোকের জন্য খারাপই লাগলো । শুনলাম একবছর হয় ওনার বিয়ে হয়েছে । সদর স্টেশনে যখন পোস্টিং ছিলো স্ত্রী ওনার সাথেই থাকতেন । কিন্তু শিমুলগাঁওতে পোস্টেড হওয়ার পর বউকে রেখে এসেছেন দুর্গাপুরের বাড়িতে । নববধূর বিরহে ভদ্রলোক বেশ কাতর বলেই মনে হল ।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম , ' তা ভূতের গল্পটা রটলো কি করে ? '

' সে গল্প আমার আসার আগের , আমার পরেও থাকবে বোধহয় । '

ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে মনে হল উনি এ বিষয়ে কথা বলতে চাননা ।

প্রলয় তবু বলল , ' আপনি কিছু দেখেছেন টেখেছেন ? '

' অন্যের মুখের ঝাল খেয়ে কি করবেন ! এতদূর যখন এলেন , নিজেরাই না হয় ...।'

এরপরে আর এ নিয়ে কথা চলেনা ।প্রায় ঘন্টা খানেক গল্প করে প্রদীপ বাবু ওঠার তোড়জোড় করলেন ।যাওয়ার সময় ঘর থেকে বেরতে গিয়েও উনি ঘুরে দাঁড়ালেন ,

' যদিও আপনারা ভূত দেখতেই এসেছেন তবুও রাত বিরেতে দরজা না খোলাই ভালো , বিপদতো আর শুধু ভূতে আসেনা । '

প্রদীপবাবু চলে যাওয়ার পর দরজাটার দিকে এক পলকে একটু দেখলাম । পাতলা কাঠের দু পাল্লার দরজা । নিচের দিকে ক্ষয় ধরেছে । এ দরজা দেওয়া না দেওয়ার মধ্যে মানসিক শান্তি ছাড়া আর কিছু পার্থক্য হবে কিনা জানা নেই । সঙ্গে মূল্যবান কিছু নেই ফলে চোর ডাকাতের চিন্তা নেই । তবে জানালা দিয়ে পেছনের জঙ্গলটার দিকে চোখ যেতে একটা আশঙ্কা জেগে উঠলো । রাত বিরেতে যদি সত্যি কোনো বুনো জন্তু উপস্থিত হয় , শংকরের স্টেশনে আফ্রিকার রাজার আগমনের মতন না হোক শেয়াল টেয়াল আসা অস্বাভাবিক নয় বা গজরাজের আনাগোনা । সেরকম সম্ভাবনা থাকলে প্রদীপ বাবু নিশ্চয়ই স্পস্ট ভাবে বলতেন । নিজেকে খানিকটা সান্ত্বনাই হয়তো দিলাম ।

' রাতের খাওয়াটা সেরে নিলে হয় না । ' প্রলয়ের ডাকে খেয়াল হলো নটা বেজে গেছে । পেছনের জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসছে । দরজার বাইরে ঝিম মারা হলুদ আলোয় উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মের একটা আভাস পাওয়া যায় । তার পিছনে ঘন নিকষ অন্ধকার । আমাদের ঘরের ইমার্জেন্সি সাদা আলোটাও কয়েক ঘন্টা জ্বলে ম্লান হয়ে এসেছে যেন ।

' হ্যাঁ , আর দেরী করার মানে হয়না । ' বিজনও সায় দিলো ।

রাতের খাবার বলতে ডায়েট চিড়ে - ঝুড়ি ভাজা , কেক , শনপাপড়ি আর সনাতনদের গ্রাম মোহনপুর থেকে সংগ্রহ করা মাথা পিছু দুটো করে রুটি আর তরকারি । ঝাল ঝাল তরকারিটা মুখে বেশ লাগলো ।

খাওয়া শেষ করে আমি , বিজন আর সৌমেন প্ল্যাটফর্মে এলাম । স্মোক ধরলাম । বর্ষার আকাশ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ঢাকা , একটা পাতাও নড়ছে না । একটা গুমোট পরিবেশ ঘিরে রেখেছে রাতের শিমুলগাঁও স্টেশনটাকে । উঁকি মেরে দেখলাম স্টেশন মাস্টারের কোয়াটারটি অন্ধকার- ভদ্রলোক শুয়ে পড়েছেন নিশ্চয় । আচমকা একটা জান্তব চিৎকারে তিনজনই চমকে উঠলাম । একটা পেঁচা খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল । একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো সৌমেনের মুখ থেকে । বুঝলাম ও ভয় পেয়েছিলো । সিগারেট শেষ করে ফিরে এলাম ওয়েটিং রুমে । ঠিক হল দুভাগে রাত জাগব । আমি আর বিজন আড়াইটা অবধি তার পর প্রলয় আর সৌমেন ।

সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় ইমার্জেন্সিটা জ্বালিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে আসা হল । হাওয়া বালিশ ফুলিয়ে ত্রিপলের ওপর একধারে সৌমেন আর প্রলয় লম্বা হয়ে নিল । আমি রুকস্যাক ব্যাগটায় হেলান দিয়ে একটু গুছিয়ে

বসলাম । বিজন যথারীতি মোবাইলে মগ্ন । আমি জানি ও এসময়ে মোবাইলের নোটপ্যাডে আজকের অভিযানের অভিজ্ঞতা লিখে রাখছে । সত্যি ভূতাভিযানে বেড়িয়ে তো অভিজ্ঞতা কিছু কম হলো না । কলকাতার নামি ভূত বাড়িতে গিয়ে সেখানকার জীবিত বাসিন্দাদের গালি খেয়েছি , মফস্বলের পোড়ো

বাড়িতে মদে মাতালদের পাল্লায় পড়েছি । তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা যেটা হয়েছিল সেটা হলো গোরস্তানে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা । রাত কেটেছিলো নির্বিঘ্নেই কিন্তু বাড়ি ফিরে ধুম জ্বর । মা - কাকিমা সবাই নিশ্চিত তেনাদের নজরেই এই কান্ড । শেষমেষ ব্লাড রিপোর্ট জানান দিলো তেনারা নয় মশাদের আশীর্বাদ । ডেঙ্গুর ধাক্কা সামলাতে প্রায় এক মাস লেগেছিলো ।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেই জানি না । আবার ঘুমটা কেন ভাঙ্গল সে বিষয়েও নিশ্চিত নই । বোধহয় ঘুমের মধ্যেই বাইরে একটা ট্রেনের শব্দ পেয়েছিলাম । তন্দ্রা কেটে যেতে দেখি বিজন আমার দিকে চেয়ে বসে আছে ; বলল ' একটা ট্রেন এসেছে ।' হাত ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে । খেয়াল করলাম ঘরের ভেতরটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে । কে জানে বাইরে বৃষ্টি হয়েছে বোধহয় । যদিও বৃষ্টির কোন শব্দ আমি পাইনি ।

আচমকা ঠক্ ঠক্ শব্দে দুজনেই সোজা হয়ে বসলাম ।

' কেউ আছেন ? ' বেশ গম্ভীর গলা ।

' হ্যাঁ , আসুন । ' বিজনই উত্তর দিলো ।

শব্দ করে দরজাটা খুলতেই দেখলাম এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজা জুড়ে । হাইট প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি । শরীরের গড়ন বেশ স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয় । বুটের মচমচ শব্দ তুলে আগুন্তুক ঘরে ঢুকলেন । ইমারজেন্সির আবছা আলোয় দেখলাম সাদা জামা সাদা প্যান্ট । আমাদের ত্রিপলে না বসে দেওয়ালের সাথে লাগানো সিমেন্টের চেয়ারে বসলেন । দূরবর্তী ইমার্জেন্সির আলোয় খুব ভালো ভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে , তবে আন্দাজ হয় বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি । তবে হ্যাঁ, লোকটার মুখে যেন জন্মগত একটা অত্যন্ত রহস্যময় হাসি লেগেই আছে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল আমার সেই হাসিটা।

' আমার নাম ধীরাজ সোম , আমি গার্ড , গুডস ট্রেনের । ' গলার স্বর শুধু ভারিক্কি নয় কথা বলার টোনের মধ্যেও একটা অথরিটেরিয়ান ভাব আছে ধীরাজ বাবুর ।

' আপনারা ? '

সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় দিলাম ।

' অসময়ে এসে ঘুমের ডিস্টার্ব করলাম বোধহয় । '

কথাবার্তার শব্দে ইতিমধ্যে প্রলয় আর সৌমেনও উঠে পড়েছে ।

' না , না । ভালোই হল বরং গল্প করে খানিকটা সময় কাটানো যাবে । ' আমিই বললাম ।

' তা এখানে কি মনে করে ? '

' সেরকম কিছু না , একটু ঘুরতে বলতে পারেন । ' সবাইকে ভূতাভিযানের কথা বলা কতটা ঠিক হবে না বুঝে একটু মিথ্যার আশ্রয়ই নিলাম ।

' শিমুলগাঁও বুঝি এখন ঘোরার জায়গা হয়েছে ! '

আলো - আঁধারিতে মনে হল ভদ্রলোকের মুখে যেন একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল । কে জানে হয়তো মিথ্যাটা ধরে ফেললেন ।

' যাই হোক আপনাদের পেয়ে আমারও সময়টা বেশ ভালোই কেটে যাবে । আজ কপাল ভালো তাই ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়েছে নচেৎ বনে বাদাড়ে কোথায় ট্রেন যে সিগনালে দাঁড়াবে তা উপরওয়ালাই জানেন , ট্রেন থেকে নামারও জো থাকে না । '

প্রাথমিক আলাপচারিতা সেরে প্রলয় প্রশ্ন করলো ,

'এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে ? '

' ঝাড়খন্ড হয়ে বিহার । '

'কি আছে এই ট্রেনে ? ' প্রলয়ের কৌতূহলের শেষ নেই ।

'কোলকাতা বন্দর দিয়ে আমদানি করা নানা জিনিস যাচ্ছে , যেমন ধরুন ইলেকট্রনিক্স গুডস , বিদেশী জামা কাপড় ইত্যাদি । '

' আমার ছোটবেলায় মনে হত মালগাড়ির ড্রাইভার আর গার্ডের মতন পেশেন্স আর কারো নেই । যেখানে সেখানে যখন তখন গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিগনালের জন্য অনন্ত অপেক্ষা । ' বেশ সহনাভূতির সুরেই বলল সৌমেন ।

' শুধু অপেক্ষা ! এতো মূল্যবান সম্পদ থাকে । দস্যু -দুর্বৃত্তের হানাও অস্বাভাবিক নয় । ' ধীরাজ বাবুর গলাটা যেন একটু উদাস শোনালো । ' আচ্ছা আপনিতো এ লাইনে হামেশাই যাতায়ত করেন , কখনো কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার ?' এবার সৌমেন শুরু করলো ।

' কি রকম রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বলছেন ? '

' এই ধরুন দস্যু , বন্য জন্তু বা ..'

' বা ! '

' অশরীরী । '

' অশরীরী ! ...হা হা হা । ' ধীরাজ বাবুর হাসির দমকে ঘরটা যেন কেঁপে উঠলো ।

' ইয়ংম্যান , অশরীরীর চেয়ে শরীরীরা অনেক ভয়ংকর , নৃশংস ,ক্ষতিকর । কখনো শুনেছো ভূত ভূতের ক্ষতি করেছে ! কিন্তু মানুষ তাঁর স্বার্থে লাগলে অপর মানুষের চরমতম ক্ষতিও করতে পারে । ' একটু দম নিলেন ধীরাজ বাবু । শরীরটাকে একটু পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন ,

' বেশী দূর যেতে হবে না , এই অঞ্চলে এমন দস্যুও আছে যারা বাধা পেলে মানুষ পর্যন্ত মারতে পারে । ' বুঝলাম লোকটা ডাকাতের কথা বলছে । এ অঞ্চলে ডাকাতদেরও উৎপাত আছে তাহলে!

' সত্যি ! ' মনে হল প্রলয় ভয় পেয়েছে । ভূতে ভয় না থাকলেও মানুষ মারা ডাকাতে ভয় থাকতেই পারে । রাত বাড়ার সাথে সাথে গল্প চলতে থাকলো সমান তালে । জানলাম ধীরাজ বাবুর বাড়ি উত্তর কলকাতায় । বাঙ্গালীর আড্ডায় যা যা আসে সেই ফুটবল , সিনেমা , রাজনীতি সবই ছুঁয়ে আড্ডা চলল নিজস্ব স্রোতে ;প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওনার যুব বয়সের স্মৃতিচারণ । এক ধরনের মানুষ থাকে যাঁরা নিজেদের সময়ের সব কিছু সেরাতে বিশ্বাস করেন । মনে হল ধীরাজ বাবুও সেই দলের । কথায় কথায় উত্তর কলকাতার পুজোর কথা উঠলো । বললেন অনেক বছর হয়ে গেল ওনার পুজো দেখা হয় না । বুঝলাম উঁনি চাকরিকেই জীবনের ধ্যান জ্ঞানে পরিণত করে ফেলেছেন । গল্পে মশগুলই ছিলাম আচমকা চমকে উঠলাম রেলের হুইসেলের শব্দে ।

' ঝাঁ জি হুইসেল দিচ্ছেন । সিগনাল গ্রীন হল তাহলে । ' ধীরাজ বাবু উঠে দাঁড়ালেন । ' ইয়ংমেন , আসি তাহলে , আর হয়তো দেখা হবেনা । আশা করি আপনাদের ঘুরতে আসার উদ্দেশ্য সফল হবে । '

' ইট' স আ স্মল ওয়ার্ল্ড , বলা যায় না আবার দেখা হতেও পারে । ' সৌজন্যের খাতিরে বলে উঠল সৌমেন।

মুখে সেই রহস্যময় হাসিটা নিয়েই ধীরাজ বাবু বেড়িয়ে গেলেন । কেমন যেন ধোয়াসার মতো ভদ্রলোকটি এলেন আবার সেই ধোয়াসার মধ্যেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। ঘড়িতে তখন পৌনে চারটে , আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিস্কার হতে শুরু করবে । বোধহয় আমাদের এবারের অভিযানও ভূতহীনই রয়ে গেল । আমাদের চারজনের চোখে চোখে একটা ইশারা হয়ে গেল । তারপর চারজনই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পরলাম ।

ঘুমটা যখন ভাঙলো ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা , চোখে রোদ এসে পরতেই উঠে বসলাম । বাকি তিনজন তখনোও শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে । পাশের ঘরটায় লোকের সাড়া পেলাম । ওয়েটিং রুম থেকে বেড়িয়ে দেখলাম শার্ট প্যান্ট পরা একজন পাশের ঘর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছেন । সকালের নরম রোদে শিমুলগাঁওকে বেশ লাগছে । বাকি তিনজনকে তুলে , ফ্রেশ হয়ে দলবেঁধে চলে এলাম স্টেশন মাষ্টারের ঘরে । ঘরে তখন প্রদীপবাবু ছাড়াও স্থানীয় একজন ব্যক্তি ছিলেন , পরনে তাঁর হাঁটু অবধি তোলা ধুতি গায়ে হাত কাটা ফতুয়া ।

' আসুন , আসুন । ' প্রদীপ বাবু হাসি মুখে সবাইকে আমন্ত্রণ করলেন । দেখলাম আমাদের জন্য ফ্লাস্কে চা করে এনেছেন উঁনি । প্লাস্টিকের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন ,' তাহলে শিমুলগাঁও কেমন লাগলো ? '

' বেড়ে জায়গা মশাই , সকালের রোদে যেন আরো রূপ খুলেছে , সবুজে মোড়া সুন্দরী । এত সবুজতো আর কলকাতায় দেখা যায়না । ' প্রলয়কে কাব্যিতে পেয়েছে ।

' ভোরটা এখানে আরো সুন্দর , আপনারা ওটা মিস করলেন । '

' হ্যাঁ , আসলে কাল রাতে একজনের সাথে আলাপ হল , গুডস গার্ড , ধীরাজ সোম । ওনার ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে ছিল এই স্টেশনে । ' বলে উঠল সৌমেন ।

' বাবু, ওনারা কি ..'

' বংশী তোমার টিকিট কাটা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে , তুমি যাও ...যাও । ' স্থানীয় লোকটি আমাদের আলোচনায় ঢোকার চেষ্টা করায় প্রদীপ বাবু কিছুটা বিরক্তই হলেন যেন ।

"কিন্তু বাবু, ওনাদের কথা শুনে তো মনে হয় ওনারা...."

প্রদীপবাবু বোধহয় আরও একবার ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই বংশী নামী সেই লোকটিও কথা না বাড়িয়ে মাথা নিচু করে স্টেশন ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল ।

"কি বলছিল লোকটা? বুঝলাম না তো ঠিক ..." কৌতূহলবসত জিজ্ঞেস করলাম।

"আরে ও কিছু নয়, প্রায় ই যাতায়াত করে লোকটা এই লাইনে । " বললেন প্রদীপবাবু।

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু সত্যি বলুন তো, আপনি কি কিছু লুকাচ্ছেন আমাদের থেকে ?" এবার সৌমেন বলে উঠল ।

"দেখুন, আপনারা সেই শহর থেকে এখানে ঘুরতে এসেছেন। রাত্রিবাস ও করলেন, এতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি । তবে শিমুলগাঁও কে এখনও অব্দি আপনারা চিনে উঠতে পারেননি, এখানকার প্রতিটি কোণায় কোণায় অজানা অনেক গল্প লুকিয়ে আছে। সেসব গল্প সবাইকে বলা যায়না, সত্যি বলতে কি এতে আমার স্টেশনেরই ক্ষতি। হাতেগোনা যে কয়েকজন তাও বা টিকিট কাটে শিমুলগাঁও থেকে, এসব শুনলে তারাও আর এই স্টেশনের ত্রিসীমানায় দেখা দেবেনা । কিছুই না, পরের স্টেশন থেকে টিকিট কেটে নেবে। আমার চাকরি টা বেঘোরে খোয়া যাবে..." কিছুটা দুঃখের সাথে কথাগুলি বললেন প্রদীপবাবু।কিছুক্ষন সবাই চুপ । অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন উনি নিজেই,

"তবে শুনুন ঘটনাটা। আজ অব্দি এই স্টেশনের কর্মচারী আর শিমুলগাঁও এর স্থানীয় কিছু লোক ছাড়া বাইরের কেউ এই ঘটনার ব্যাপারে জানেনা। আসলে আমরাই জানতে দিই নি। আপনারা এক অর্থে ভূত খুঁজতেই এসেছিলেন তাই আপনাদের কাছে বলেই ফেলছি ব্যাপারটা । তবে হ্যাঁ, দয়া করে এই ঘটনাটা পাঁচকান করবেননা। এতে আমারই চাকরি নিয়ে টানাটানি লেগে যাবে। "

"আমরা কথা দিচ্ছি প্রদীপবাবু..." সৌমেন বলল ।

আবার বলে উঠলেন প্রদীপবাবু "আপনারা যে ধীরাজ সোমকে গতকাল রাত্রে দেখলেন, উনি গত হয়েছেন আজ প্রায় ৬ বছর হয়ে গেল। "

"কি.. কি ? বলছেন টা কি আপনি?"- প্রায় আঁতকে উঠল প্রলয় ।

"শান্ত হন আপনারা, জানি ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিন্তু এটাই সত্যি। বছর ছয়েক আগে এই শিমুলগাঁও ছিল আরও নির্জন এবং এক কথায় ছিল ডাকাতের আড্ডা। পথে ঘাটে প্রায় রোজই কেউ না কেউ ডাকাতের খপ্পরে পড়ত। সেরকমই এক রাত্রে আমাদের এই গার্ডসম্যান ধীরাজ সোম তাঁর বাড়ি থেকে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, নাইট ডিউটি। তখন অবশ্য আরও দু তিনটে ট্রেন থামত এখানে। তাঁর বাড়ি থেকে স্টেশন আসার পথ ছিল অতি বিপজ্জনক, এক প্রকান্ড জঙ্গল পেড়িয়ে আসতে হতো। আর সেই রাত্রেই ঘটলো বিপদ..." প্রদীপবাবুকে বাঁধা দিয়ে প্রলয় বলে উঠল - " উনি ডাকাতের পাল্লায় পড়লেন ? "

"হ্যাঁ " - গম্ভীর স্বরে বললেন প্রদীপবাবু। " আমি যদিও তখনও আসিনি শিমুলগাঁও এ। এসব ঘটনা আমি শুনেছিলাম এখানকার প্রাক্তন স্টেশন মাস্টার বীরেনবাবুর কাছে। আমি যদিও ওনার মৃতদেহটি দেখিনি, দেখার কথাও নয় - তবে শুনেছিলাম ডাকাতদের বন্দুকের গুলিতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । এরপর আরও কতই গার্ডসম্যান এলো আর গেল শিমুলগাঁও এ, তবে উনি ওনার নাইট ডিউটি আজও দায়িত্বের সঙ্গে করে চলেছেন..." দেখলাম বিষন্নতায় ভরে উঠেছে প্রদীপবাবুর মুখমন্ডল। অবশ্য এ নিয়ে আর কিছু বলার বা ভাবার সুযোগ পেলাম না , কিছু কিছু ঘটনা শোনার পর একরকম নীরব থাকাটাই শ্রেয়। খানিক্ষন বাদেই সনাতন এসে হাজির । ওকে বলাই ছিল আটটা নাগাত আসতে সেই তুলনায় কিছুটা দেরি করেছে বলা যায়।

' বাবুরা রেডিতো ! '

' হ্যাঁ , রেডিই একরকম । ' প্রলয় বলল । ব্যাগ ট্যাগ প্যাক করেই এই ঘরে এসেছিলাম । চা টাও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললাম । তারপর প্রদীপ বাবুর সাথে দু চারটে সৌজন্যমূলক কথা বলে বেড়িয়ে এলাম । প্রদীপ বাবুও আমাদের পিছন পিছন প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত এলেন । সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন , ' আবার আসবেন বলবোনা , তবে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো । ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে । '

' নিশ্চয়ই । ' বলে আমরা রওনা দিলাম সনাতনের পিছু পিছু রেললাইন পেরিয়ে মোরাম বিছানো রাস্তার উদ্দেশ্যে , যেখানে দাড়িয়ে আছে ওর মোটর ভ্যান । পেছনে পড়ে রইল শিমুলগাঁও , শিমুলগাঁওর স্টেশন আর তার মাস্টার মশাই । সে সময় কেউ যদি পেছনে ফিরে দেখতো , তাহলে দেখতে পেত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শিমুলগাঁওর স্টেশন মাস্টার অজানা কারো উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছেন। হয়তো সেই বিধাতা পুরুষকে প্রণাম জানাচ্ছেন যিনি আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিলো

সকাল আর দুপুরে দুটো প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া এ লাইনে এখন আর কোনো ট্রেন চলেনা ।অথবা হয়তো ছয় বছর আগে ডাকাতের গুলিতে নিহত সেই গুডসগার্ডের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছেন যিনি আজও কর্তব্যনিষ্ঠ ভাবে ডিউটি করে যাচ্ছেন প্রতি রাতে ।

যাই হোক, মোটর ভ্যানের জানলার বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে মনটা বার বার বলে উঠছিল 'আমাদের ভূতাভিযান খুব একটা বৃথা যায়নি...'

বীরাঙ্গনা অনন্যা

- তরুন মণ্ডল

অনন্যার যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে নিজেকে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করল একটা দমবন্ধ করা গুড়াম ঘরের মধ্যে। সম্ভবত ঘরটা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনো মুদি দোকান কিংবা রেশন দোকানের । মাথাটা ঝিম ঝিম করছে কিছুই ঠিক ভাবে মনে পড়ছে না।

ছোট থেকেই অনন্যা সচেতন বুদ্ধি সম্পন্ন, কোনো কিছুতেই সে চট করে ঘাবড়ে যায় না। চেষ্টা করল হাতের বাঁধনটা খোলার। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ছোট্ট সাইজের পাখা। সে ততক্ষনাত বাঁধা পায়ের সাহায্যে পাখাটা নিজের দিকে টেনে আনলো, যদিও তাকে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হল। দেখে মনে হল পাখাটা খারাপ, তাই তার বর্তমান বাসস্থান এই স্টোর রুম। অনন্যা সেই পাখার পাখনা গুলোতে নিজের হাতের বাঁধা দড়িটা ঘষতে থাকল। অবশেষে সাফল্য। পাশেই রাখা জলের বোতল থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে একটু সক্রিয় হতে চেষ্টা করলো সে।

অনন্যার বয়স ২০। লেডি ব্রাবোর্নে কলেজে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে বি.এস সি হনার্স পড়ছে। অনন্যাদের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে। বাড়ি বলতে আছে শুধু দাদু আর নাতনী।

এক বিমান দুর্ঘটনায় অনন্যা তার মা আর দেবাশিস বাবু তার একমাত্র ছেলেকে হারায় ! ছেলে বউয়ের এল আই সি কভারেজ আর নিজের পেনশনের টাকায় দাদু নাতনীর সুখেই সংসার চলে যায়। দাদুর একমাত্র সম্বল তথা বাঁচার শক্তি তার নাতনী অনন্যা । দাদু অনন্যার জন্য নিজের জীবনের পরোয়া করতেও ভুলে যাবে। সেই অনন্যা এখন মহা বিপদের মধ্যে।

অনন্যা সমানের লোহার দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো, বুঝতে পারল বাইরে থেকে তালা দেওয়া, তাই বল প্রয়োগ করা বৃথা। অনন্যা দেখল তার কলেজ ব্যাগটা একপাশে পরে রয়েছে। মনে, রাস্কেল দুটো ব্যাগের কথা ভুলে গিয়েছে ভাবতে ভাবতে সে ব্যাগটার কাছে এলো। অনন্যার মেমোরি খুব শার্প ও ভালোই জানে কোনো চেনটা খুললে কাজ হবে দ্রুত। হলোও তাই। ইমারজেন্সি ফোনটা ব্যাগেই রয়েছে। দুদিন অন্তর দাদু ফুল চার্জ দিয়ে সমস্ত সিগনাল চেক করে সুইচড অফ করে ব্যাগে পুরে দেন যাতে কলেজে ক্লাসের সময় কোনো অসুবিধা না হয় আবার কোন বিপদে পড়লে এস ও এস পাঠাতে পারে নাতনী!

অনন্যা দাদুর নম্বর এ প্রথমে "এস ও এস" লিখে টেক্সট করলো। দ্রুত সিন ।

দাদু: "আর ইউ ওকে?"

অনন্যা: "ইয়েস!"

দাদু: "পুলিশ রেডি," অর্থাৎ পুলিশ তলাসি চালাচ্ছে।

অনন্যা: " টু বয়েজ কিডন্যাপ মি!"

দাদু: "ডোন্ট ওয়ারী আই উইল ফাইন্ড ইউ ভেরি সুন!"

অনন্যা: "আই ডোন্ট নো দ্যা প্লেস, প্রবাবলী দিস ইস এ স্টোর রুম!"

দাদু: "গ্রোসারি/মেডিসিন/ফ্যাক্টরি/ আদার্স?"

অনন্যা: "গ্রোসারি" !

দাদু: "ওকে!"

শেষের ওকে মেসেজ অনন্যার দেখা হল না। দুটো ছেলের গলার আওয়াজ বাইরে থেকে ভেসে এলো। সে দ্রুত আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলো, হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায়।

ছেলে দুটো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। তারা দেখল অনন্যার জ্ঞান ফিরেছে। এই ছেলে দুটোই যে সেই রাস্কেল দুটো সেটা বুঝতে খুব অসুবিধা হয়না।

দুটোর মধ্যে একটি ছেলে বললো –

তাহলে মামণি জ্ঞান ফিরেছে…?

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল আরে ক্লোরফেনের প্রভাব তো মাত্র দু-ঘন্টা।

প্রথম ছেলেটি হাসতে হাসতে বললো ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চিন্তা নেই মামণি আমাদের প্রভাব আজ সারা রাত থাকবে।

অনন্যা, কোনো রিএক্ট করলো না।

ছেলে দুটো বেরিয়ে গেলো।

অনন্যা ইমারজেন্সি ফোনটা চেক করলো এখন টাইম ১৯:৫৩ আর মাত্র কয়েক ঘন্টা যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

দুই

অনন্যার যখন বয়স চোদ্দ তখন ওর বাবা মা মারা যায়। এই মৃত্যু দাদুকে পুরোপুরি ভেঙ্গে দেয়। তারপর থেকে দাদুর একমাত্র সম্বল হয়ে যায় অনন্যা, তাই দাদু চায় নাতনী পড়াশোনা শিখে সিভিল সারভেন্ট হোক! তাই দাদুর ইচ্ছে পূরণের জন্যই অনন্যা আর অন্যকোনো দিকে মনে দেয় না। শুধু মাত্র ষ্টাডি, আর ষ্টাডি!

ক্লাস টেন ও টুয়েলভে ও স্কুলে দরুন রাঙ্ক নিয়ে লেডি ব্রাবোর্নে কলেজে ভর্তি হয়।

সবকিছুই স্বাভাবিক চলছিল।

একদিন অনন্যা আর দাদু তাদের আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়েছিল আমন্ত্রণ রক্ষার খাতিরে। সব মিটিয়ে বেরিয়ে আসতে রাত একটা বেজে গিয়েছিলো । অনন্যা আর দাদুর বিশেষ দরকারে পারের দিন কলকাতা ফিরতেই হত।

তাই তারা রাত একটা পঁচিশের রামপুরহাট-শিয়ালদহ মেইল ধরলো বাড়ি ফেরার উদ্যোগে। রবিবারের রাত তাই ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা নেই বললেই চলে। অনন্যা আর দাদু গিয়ে বসল জানালার ধরে দুটি পাশাপাশি সিটএ!

ট্রেন কিছু দূর ভালোই এগোলো । রাত গভীর হওয়ায় অনন্যা দাদুর কাঁধে মাথা রেখে হালকা ঘুমিয়ে পড়েছিল । পরের এক স্টেশনে দুটো মাতাল ছেলে ট্রেনে ওঠে বছর চব্বিশ কি পঁচিশ হবে ছেলে দুটো। দেখে মনে হয় শিক্ষিত। কম্পার্টমেন্ট এ কুড়ি বছরের মেয়েকে বসে থাকতে দেখে তাদের দস্যুর মত চেহারায় হিংস্র পনা জেগে ওঠে। যা নিমেষে যে কোনো মেয়ের সর্বনাশ করতে পারে। তারা দুজনে প্রথমে অনন্যার বিপরীতমুখী সিট টাতে গিয়ে বসল । বসে কুরুচিকর মন্তব্য করতে লাগলো অনন্যার দিকে। মুহূর্তেই অনন্যার তন্দ্রা ভাব কেটে গেলো, অনন্যা বিরক্ত প্রকাশ করলে, দাদু তাকে বাঁধা দিয়ে শান্ত করল।

একটা ছেলে বলে উঠল – আরে দেখরে কালু বুড়োটা আবার মেয়েকে বাঁধা দেয়, আরে দাদু মেয়ে আসতে চাইছে আস্তে দিন। তা না হলে –

এবার অন্যনা আর শান্ত থাকতে না পেরে জোর গলায় বলে উঠলো

"তা না হলে কি?"

"কি তা না হলে –"

ছেলেটা সটান নোংরা এক মন্তব্যর সাথে অনন্যার হাত চেপে ধরল – অনন্যা ছেলেটাকে চর মারার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় ছেলেটি তাকে বাঁধা দিল।

এবার দাদু তার আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হল – পড়নে সাদা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি কখন যেন জেনারেল বোস এর কর্মরত থাকাকালীন ইউনিফর্ম হয়ে উঠল। দাদু দু- হাতে রাস্কেল দুটোর গলা চেপে ধরলো, দম বন্ধ হয়ে তারা যেন মরে মরে অবস্থা । দাদুর সিংহের মতন হাতের থাবা থেকে ছেলে দুটো আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেদের মুক্ত করার, কিন্তু হাত তো নয় যেন কোনো অদৈত্য শক্তি তাদের গলার টুটি চেপে ধরেছে।

ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে, দাদু তাদের চলন্ত ট্রেনের গেট থেকে ছুড়ে পুরো স্টেশন চত্বরে আছড়ে ফেলল। সে দিনের পর থেকে দাদু যেন একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করছে।

অনন্যা এবার ভালো করে স্টোর রুমটা সার্চ করে দেখল ওর কাজের মত কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ও কত গুলো কাচের বোতল দেখতে পেলো। বোতল গুলো হলুদ রঙের তরলে পূর্ণ ।

সতেরো বছর বয়সে শীতের দুপুরে দাদুর সাথে রেডিওতে সব্যসাচী চক্রবর্তীর গলায় শোনা ফেলুদার সেই সাবধানমূকল বাক্য মনে পরে গেলো অনন্যার "চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র!"। এই তরল পূর্ণ কাচের বোতল অনন্যার কাছে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের চেয়ে কম কিছু নয় । অনন্যা মনে মনে বললো রাস্কেল দুটোর খেল খতম এবার । রাত ২২:৩০, পূর্ণ মদে ডুবে এবার তারা অনন্যার কাছে এসেছে। সর্বনাশের তাদের এতই খিদে যে দরজা বন্ধ তো দূরের কথা ঘরে যে দরজা আছে সেটাই তাদের মগজে নেই আর ।

অনন্যা কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে যখন তাদের নোংড়া হাত দুটো অন্যান্য কে ছোঁয়ার চেষ্টা করল । অনন্যা স্থির ভাবে হাত দুটো পিছনে করে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল ।

প্রথম ছেলে, " এই শালি এদিকে আয়" ।

অনন্যা স্থির । ঠিক যে মুহূর্তের অপেক্ষা করলছিল অনন্যা সেই সময় আসন্ন । ছেলে দুটো এবার আরও হিংস্র হয়ে অনন্যার দিকে তেড়ে এলো, ছেলে দুটো তেড়ে আসতেই – ঠিক তখনই এক গুরুগম্ভির শব্দে ঘরটা কেপে উঠল। দুটো কাচের বোতল দুজনের মাথা লক্ষ্য করে ভেঙেছে অন্যন্যা।

কাচের বোতল দুটো ভাঙতেই বাইরে থেকে ভেসে এলো পুলিশের গাড়ির সাইরেন। অন্যন্যা এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । ছেলে দুটো চিৎকারে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে লাগল । ঠিক যেমন কোনো প্রাণীর সদ্য ধর থেকে মুণ্ডু আলাদা হলে হয় ঠিক তেমনি ।

দাদু নাতনীকে পেয়ে যেনো নতুন প্রাণ ফিরে পেলো।

দাদু, “আর ইউ ওকে?”

অনন্যা কোনো কথা না বলে শুধু দাদুকে জড়িয়ে ধরে রইলো। তার একমাত্র বন্ধু বাবা মা ভাই বন সবই তো তার এই একমাত্র দাদু। অনন্যা আলতো চোখে দেখলো চিন্তায় চিন্তায় দাদুর মুখটা শুকনো আপেলের মতো হয়ে গেছে। পরদিন সকালে অনন্যা আর দাদু বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশন এ পৌঁছালো ছেলে দুটোকে আইডেন্টিফাই করতে আর অনন্যার কিছু স্টেটমেন্ট রেকর্ড এর জন্য। অনন্যা আর দাদু যখন লকআপের সামনে দাড়ালো তখন তারা দেখল ছেলে দুটোর কারোরই আর মাথায় চুল নেই, আর মুখ নেই বললেই চলে। অ্যাসিডে সব গেছে তাদের।

বাড়ি ফিরে দাদুকে একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারলনা অনন্যা, তুমি এক্সাক্ট লোকেশনটা জানলে কি করে? আর জানলেও অত দেরিতে পৌঁছলে কেনো?

দাদু, অনন্যার ব্যাগ থেকে ইমারজেন্সি ফোনটা বের করে চার্জে বসাতে বসাতে বলল, এটা যে সে ফোন নয় – স্পেশাল মিলিটারি সার্ভিস পার্সোনাল দের জন্য তৈরি। ফোন সুইচ্ড অফ থাকলেও লোকেশন ট্র্যাক করা যায়। আর দেরি করার কারণ কিছুই না ছেলে দুটোকে হাতে নাতে ধরার জন্য রাত দশটা প্রযন্ত অপেক্ষা, আর তার মধ্যেই তুই যা করার করে ফেলেছিস, আমি তো সেখানে দর্শক শুধু মাত্র ।

দাদু, “যাই গরম গরম অমলেট তৈরি করি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে খাওয়া যাবে!”

শেষ সীমান্ত লোকাল

- অয়ন কুমার হালদার

---------------------- (১) ----------------------

রাত তখন সাড়ে বারোটা। আমি আপ রানাঘাট লোকাল থেকে নামলাম কল্যাণী ষ্টেশনে। যদিও যেতে হত কল্যানী সীমান্তে, কিন্তু এতো রাতে সীমান্ত লোকাল থাকে না, তাই অগত্যা এই ট্রেনেই ফিরতে হল। ডিসেম্বরের শেষের দিক, তাই শীতটাও জাঁকিয়ে পড়ছিলো। ট্রেনে জানলা-দরজা বন্ধ ছিলো, তার উপর গুটিসুটি মেরে বসে ছিলাম বলে তখন বুঝতে পারিনি, তবে ষ্টেশনে নামতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপুনি দিয়ে উঠছিলো সারা গায়ে।

আমি ফিরছি দমদম থেকে, আমার এক বন্ধু মিমির জন্মদিন ছিলো। ওর বার্থডে সেলিব্রেশনের পর, দুজনে শীতের রাতে শহরের ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে কখন যে এতো দেরী হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি। এতো রাত পর্যন্ত বন্ধুর সাথে হাতে হাত রেখে ঘুরছিলাম, এটা শুনে আপনারাও হয়তো বুঝতেই পারছেন কেমন বন্ধু সেটা। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় আলো-অন্ধকার রাস্তায় হাত ধরে একে অপরের উষ্ণতা ভাগাভাগি করার নেশাই সময়ের খেয়ালই ছিলো না একদম। ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই বুঝলাম এর থেকে বেশি দেরি হলে আর মেসে ফেরা হবে না আমার। মিমির বাড়িটা ষ্টেশনের একদম সামনেই, তড়িঘড়ি করে মিমিকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, ছুটে এসে ট্রেন ধরলাম। কল্যাণী সীমান্ত যাওয়ার ট্রেন আর পাওয়া সম্ভব না, অন্তত কল্যানী জংশনে পৌঁছনো গেলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে, তাই অগত্যা এই ট্রেনেই উঠলাম।

কল্যাণী সীমান্ত স্টেশনটা একটু অন্যরকম। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব লোকাল ট্রেন ছাড়ে সেগুলো মূলত কোনো না কোনো বড় স্টেশন বা জংশন থেকেই ছাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়মটা একটু ভিন্ন, কিছু স্টেশন যেমন নৈহাটি, ব্যারাকপুর - থেকে ছাড়া নৈহাটি বা ব্যারাকপুর লোকাল গুলো স্টেশনেরই কোন প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ে। তবে কল্যাণীর ক্ষেত্রে ট্রেনটা মেইন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে না ছেরে, কল্যাণী শহরের মাঝখানের একটা ষ্টেশন কল্যাণী সীমান্ত থেকে ছেড়ে মেইন ষ্টেশন হয়ে চলে যায় ডাউনে শিয়ালদার দিকে।

সীমান্ত সহ মাঝে আরো দুটো স্টেশন দিনের বেলায় প্রচন্ড জনবহুল থাকলেও, এই ষ্টেশনগুলো সন্ধ্যার পর এমনিতেই বড্ড ফাঁকা হয়ে যায়, তার ওপর লকডাউন এর জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব প্রায় বন্ধ। তাই

ট্রেন চালু হলেও যাত্রীবিহীন হয়ে একাকী থাকতে হয় স্টেশন চত্বর গুলোকে এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত স্টেশন নিয়ে ভুতুড়ে কিছু গল্পও তৈরি হয়েছিল। আমিও সেগুলো শুনেছিলাম কিন্তু আমার কাছে ওগুলো প্রামাণিক বা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কোনদিনই। যায় হোক, ট্রেনে উঠে দেখি ট্রেনে যাত্রী একদমই নেই বললেই চলে। এদিক ওদিক কয়েকজন বয়স্ক লোক চাদর জড়িয়ে বসে আছে শুধু। প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য কম্পার্টমেন্টের জানালা-দরজাও সব বন্ধ, তাই বাইরের কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। তবে বেশ রোমাঞ্চকর একটা ফিল আসছিলো। এরই মাঝে কখন যে কল্যাণী পৌঁছে গেলাম বুঝতেও পারলাম না।

---------------------- (২) ----------------------

ট্রেন কম্পার্টমেন্টে নাম মাত্র কয়েকজন থাকলেও, কল্যাণী ষ্টেশনে নেমে একজনকেও দেখতে পেলাম না। পুরো ষ্টেশন জুড়ে অস্বাভাবিক এক নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে যেনো। দেখলাম এই ট্রেন থেকেও আমি একাই নেমেছি এখানে। বাইরে বেরিয়েও দেখি কোথাও কোনো লোকজন নেই, অটোওয়ালারাও এই ঠান্ডায় বাড়িতে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে এতক্ষণে। কিন্তু এখান থেকে আমার মেস প্রায় ৮ কিমি, এতোটা রাস্তা হেঁটে পৌঁছনো সম্ভব না। আর এদিকে যা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, তাতে এখানে থাকলে দু-মিনিটেই জমে যাবো, তাই ষ্টেশনের চার নাম্বার প্ল্যাটফর্মের বন্ধ টিকিট কাউন্টারের সামনে গিয়ে বসলাম, এখানে তেমন হাওয়া লাগবে না। আর ঠিক তখনই আমার ফোনটা বেজে উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি ফোনটা রিসিভ করলাম, কারন আমি জানতাম ফোনটা কে করেছে।

~ এই কোথায় তুমি? পৌঁছে গিয়েছ? - ঘুমঘুম গলায় আর চিন্তার সুরে বলল মিমি।

আমি মজা করে বানিয়ে বানিয়ে বললাম,

-- আর পৌঁছনো! ট্রেনটা এতো লেট করলো যে এখানে আসতে আসতেই পুরো ষ্টেশন ফাঁকা একদম। গাড়িঘোড়াও কিছু নেই, তাই প্ল্যাটফর্মেই বসে আছি।

~ কি করবে তাহলে এখন? ষ্টেশন থেকে তো তোমার মেস অনেকটায় দূরে।

-- কি আর করা যাবে! এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে আজ রাতটা।

~ তোমাকে তো বলেছিলাম আমাদের বাড়িতেই থেকে যাও আজ। (একটু দুষ্টুমি ভরা গলায় বলল মিমি)

~ আচ্ছা! আর তুমি কি বলতে বাড়িতে? আমি গেলে তুমি কি বলতে যে, মা দেখো তোমার জামাই এসেছে?

~ আরে ধুর!! আমি বলতাম এটা দাদা হয় একটা, কলেজের সিনিয়র।

~ হু! এই জন্যই তো যাইনি আমি। কোনোভাবেই তোমার দাদা হওয়ার শখ নেই বুঝলে।

~ তাহলে হাঁটো এবার। আমার হাত ধরে ফাঁকা রাস্তায় হাঁটার খুব শখ ছিলো না! এবার রাস্তায় ভুতের হাত ধরেই হাঁটো।

-- হ্যাঁ সেটায় করতে হবে। তুমি এবার ঘুমিয়ে যাও বুঝলে। অনেক সকালে উঠে তো মন্দিরে গিয়েছিলে পুজো দিতে, টায়ার্ডও আছো। আর আমার জন্য টেনশন কোরো না, আমি দেখছি কি করা যায়!

~ তুমি না বললেও আমি যাচ্ছিলাম ঘুমাতে। মাঝ রাত্তিরে হাত ধরে হাঁটার শখ তোমারই হয়েছিলো, এবার তুমিই বোঝো।

-- কি মেয়ে রে বাবা! এই তো সেদিন নিজেই আমাকে বললে যে তোমারও শীতের কুয়াশা ভরা রাতে ফাঁকা রাস্তায় হাঁটার অনেকদিনের ইচ্ছা তোমার।

~ ভালো লাগে বলেছিলাম, আজকেই সেই ইচ্ছা পূরণ করতে হবে বলিনি।

~ বাহ! এখন সব দোষ আমার হয়ে গেলো? আচ্ছা শোনো না, খুব ঠান্ডা এদিকে, জমে যাচ্ছি পুরো। একটু গরম কিছু পাওয়া যাবে না?

~ অসভ্য একটা। নিজের ব্যাগটা আগে চেক করো তুমি...... আচ্ছা ঠিকাছে এখন রাখছি, ঘুম পাচ্ছে খুব।

কথাটা বলেই ফোন রেখে দিলো মিমি। আমি ব্যাগটা খুলে দেখি ছোটো একটা গোলাপি হটপট টিফিন বক্স। ওটা খুলে আমি অবাক, দুপুরে শাশুড়িমা বিরিয়ানি বানিয়েছিলো শুনেছিলাম, কিন্তু মিমি সেটা আমার ব্যাগে কখন রেখে দিলো সেটা একদমই বুঝতে পারিনি। এখনও হালকা গরম আছে, আমি চামচের পরোয়া না করে হাত দিয়েই খাওয়া শুরু করলাম। ওর এই কেয়ারিং নেচারের প্রেমে আবার পড়েই যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি বড়ো লেগপিসের এক সাইড উধাও। বুঝলাম আমার জন্য বিরিয়ানি প্যাক করার সময় ওই পেটুকটায় খেয়েছে এটা।

----------------------- (৩) -----------------------

খাওয়াদাওয়ার পর সিমেন্টের চেয়ারের এক কোনায় চোখটা বন্ধ করে বসে আছি, চোখটা সবে লেগে এসেছে। আর ঠিক সেই সময় ষ্টেশনের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

"03155 আপ,, শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল,, 4 নং প্ল্যাটফর্মে আসছে।"

কিন্তু এই সময় তো ট্রেন থাকেনা এদিকে কোনো। তাড়াতাড়ি করে রেলের অ্যাপ্লিকেশন চেক করে দেখলাম, না, কোনো ট্রেন দেখাচ্ছে না এখন। মনের মধ্যে একটু খটকা লাগল, তারপর ভাবলাম কি

যায় আসে! হতেও পারে অ্যাপে এই ট্রেনটা কোনোদিনই দেখায় না। এমন অনেক ট্রেনই তো আছে যেগুলো এই অ্যাপ্লিকেশনে আপডেট করা নেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা এগিয়ে আসল। আমি উঠে পড়লাম, কিন্তু উঠতেই বিশ্রী গন্ধযুক্ত, প্রচণ্ড ঠান্ডা একটা হাওয়া এসে লাগল গায়ে। ওষুধপত্র আর কোনো মরা পচা পশুর দেহের গন্ধ মেশানো একটা বিকট গন্ধ। আমি এখান থেকে নেমে অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠব ভাবছিলাম, কিন্তু তখনই ট্রেন ছেড়ে দিলো সাথে সাথেই। ঠান্ডা হাওয়া যাতে না আসে তাই আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বাকি জানালা দরজাগুলো আগে থেকেই বন্ধ ছিলো, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম পুরো কম্পার্টমেন্টে আমি একা। একটু গা ছমছম করলেও অন্যরকমের একটা রোমাঞ্চকর ফিলিং আসছিলো।

মিনিট দশেকের পথ, তবুও এক কোনায় গিয়ে চোখ বন্ধ করে বসলাম একটু। হঠাৎ গা শিউরে উঠল আমার, মনে হতে লাগল ট্রেন যেনো হাওয়ায় ভেষে এগোচ্ছে, ইঞ্জিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছি না এখন আর, অথচ ট্রেন এখন দ্বিগুণ গতিতে ছুটছে। আমি একটা জানালা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু খুলতে পারলাম না কিছুতেই। বারবার কেঁপে উঠছে আমার পুরো শরীর। মনে মনে ভাবলাম, "পরের ষ্টেশনেই নেমে যেতে হবে, এই ট্রেনে আর যাওয়া যাবে না। কিন্তু ট্রেন থামার নাম নেই, এই ভয়ানক গতিতে সে যেনো এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কিন্তু পরের ষ্টেশন তো মাত্র ৩-৪ মিনিটের দূরত্বে। তাহলে থামছে না কেনো ট্রেনটা? আমার মাথা শূন্য হয়ে আসছিলো, চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলাম এক কোনে।

এমন সময় মোবাইলে নোটিফিকেশনের শব্দে যেনো চেতনা ফিরলো আমার, চোখ খুলে বুঝতে পারি ট্রেন দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে বুঝলাম এখন আছি কল্যাণী ঘোষপাড়া ষ্টেশনে। মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখি মিমির মেসেজ, ও লিখেছে, "তোমার ফোন লাগছে না, নেটওয়ার্ক ইস্যু মনে হয় তাই মেসেজ করে রাখলাম। আমার খুব টেনশন হচ্ছে, ষ্টেশনে তো ঘুমও হবে না তোমার, তার উপর এমন ঠান্ডা চারিদিকে। আমার জন্য হ্যান্ডমেড গিফট বানাতে গিয়ে ঘুমও তো হয়নি তোমার তিন দিন।"

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না একটু আগে যা আমি দেখলাম বা অনুভব করলাম সেগুলো সত্যি নাকি সবই আমার স্বপ্ন। ওখানে বসেই চোখেমুখে জলের ছিটে দিলাম একটু, এখানে কোনো লোকজন নেই তাই কেও বলবেও না কিছু। এমন বাজে একটা স্বপ্ন দেখে ঘাম ছুটে যাওয়ার যোগার হয়েছে আমার। যায় হোক, একটু পরেই নামতে হবে, তাই জলের বোতল ব্যাগে রেখে নামার জন্য রেডি হলাম।

ভাবলাম মিমিকে একটা ফোন করে দিই, হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছে, তবুও জানিয়ে দেওয়া দরকার। ফোনটা পকেট থেকে বার করে হাতে নিয়ে দেখলাম এখনও নেটওয়ার্ক একদম নেই। ভাবলাম একটা এসএমএস করে দিই বরং, নেটওয়ার্ক আসলেই সেন্ড হয়ে যাবে। ঠান্ডায় জমে যাওয়া হাতে টাইপ করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় ভয়ানক এক আর্তনাদের শব্দ শুনে ভয়ে ফোনটা পড়ে গেলো হাত থেকে। আর সাথে সাথেই

ট্রেনের সমস্ত লাইট অফ হয়ে প্রচণ্ড ভয়ানক এক অন্ধকার ছড়িয়ে গেলো চারিদিকে। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছিলো যেনো কম্পার্টমেন্টের মধ্যেই কোনো মেয়ে প্রচন্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমি চারিদিকে তাকিয়েও কিছুই দেখতে পেলাম না। এই অন্ধকারে ফোনটাও খুঁজে পাচ্ছি না।

অবশেষে মোবাইলটা পেলাম সিটের নীচ থেকে। কাঁপাকাঁপা হাতে ফোনটা তুলতেই সীমান্ত ষ্টেশনে এসে থামল ট্রেনটা। ট্রেন আবার ছেড়ে দেওয়ার আগেই আমি তাড়াহুড়ো করে মোবাইল আর ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে। প্ল্যাটফর্মে নেমে বুঝতে পারলাম শুধু ওই কম্পার্টমেন্টেই না, পুরো ট্রেনে আমিই একমাত্র প্যাসেঞ্জার ছিলাম, কারন আর কেওই এখানে নামেনি ট্রেন থেকে। মধ্যরাতের ষ্টেশনটা ভয়ঙ্কর রকমের মায়াবী লাগছিলো, সব আলো জ্বলছে না, সামান্য কয়েকটা আলো জ্বালানো আছে। তার মধ্যেই দুটো টিউবলাইট জ্বলানেভা করছিলো। আমি নামতেই ট্রেন আবার চলে গেলো, আমি ধীরে ধীরে ষ্টেশনের বাইরে আসলাম।

ষ্টেশনের বাইরে পা রাখতেই একটা কথা মাথায় আসতেই আমার সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আমি তাড়াহুড়ো করে ছুটে ষ্টেশনের মধ্যে গিয়ে দেখি ট্রেন নেই সেখানে। আর আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই ট্রেনটা ষ্টেশন ছেড়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। কিন্তু.....

কিন্তু কল্যানী সীমান্ত তো শেষ ষ্টেশন, সামনে রাস্তা নেই আর ট্রেন যাওয়ার। তাহলে ট্রেনটা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো কীভাবে? এই প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেই আমি ঘামতে শুরু করেছি। এক বিন্দু ঘাম আমার ঘাড়ের কাছে থেকে গড়িয়ে পিঠ বরাবর নামতে নামতে আবার ঠান্ডা হয়ে শিহরণ জাগিয়ে দিলো পুরো শরীরে। আমি রিতিমতো কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম ওখানেই। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সাথে সাথেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। তারপর আর কিছুই মনে নেই আমার, সকালে যখন জ্ঞান ফিরলাম তখন প্রচণ্ড জ্বরে উঠতেও পারছিলাম না। তাকিয়ে দেখি আমি জেএনএম হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি আর পাশে আমার মেসের কয়েকজন বন্ধু বসে আছে ।।

কুহেলী

- বন্দ্যোপাধ্যায়

১ ।।

বনদপ্তরের তরফ থেকেই পলাশকে বদলি করা হলো পুরুলিয়ার এই প্রত্যন্ত গ্রাম, সীতারামপুরর। বিখ্যাত অযোধ্যা পাহাড় এর বুকে এই ছোট্ট গ্রামটি অনেকেরই অজানা, প্রথমে তো পলাশ নিজেও ঠাওর করতে পারেনি ঠিক কোথায় অবস্থিত এই গ্রামটি।

বনদপ্তরেরই একটি নিচু বিভাগের কর্মচারী, এই পলাশ। এই সদ্য বিবাহপর্ব মিটেছে তার, তাই বৌ কে উত্তরবঙ্গে একা ছেড়ে আসতে ভরসা পায়নি সে। হ্যাঁ, বড়কর্তার অনুমতি নিয়ে পলাশ সরাসরি তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়েই এখানকার সরকারি বাংলো তে উঠেছে। একরকম নতুন করে সংসার পেতেই বসেছে পলাশ এখানে।

এই সীতারামপুরের মনোরম পরিবেশ ও বেশ মন কেড়েছে পলাশের স্ত্রী, লাবণ্যের। বাংলোর চারিদিকে শুধুই ঘন জঙ্গল আর ছোটো বড় পাহাড়, বাংলোর ঠিক পেছনেই মস্ত বড় একটি পাথুরে পাহাড় উঠে গিয়েছে সটান গগন পানে।

সীতারামপুরে দিন দুএক কাটবার পর থেকেই লাবণ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে পড়তে থাকল পলাশের। যে মেয়েটা উত্তরবঙ্গে থাকা কালীন, সকাল ৮ টার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতোই না সেই কিনা এখন রোজ ভোর ৫ টায় উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছে।

ব্যাপার টা সে খেয়াল করেছিল একদিন ভোরে। সেদিন হঠাৎ অন্যদিনের তুলনায় বেশ আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পলাশের, উঠেই দেখে পাশে লাবণ্য নেই।

বার তিনেক তাঁর নাম ধরে ডাকার পর বাংলোর কেয়ারটেকার রতন এসে জানালো - " আজ্ঞে বাবু, দিদিমুনি তো ঐ জঙ্গলের দিকে গেলেন। মনেহয় প্রাতঃভ্রমণের অভ্যেস আছে "

"সর্বনাশ! এখানকার জঙ্গলে না জানি কত বিপজ্জনক জীবজন্তু আছে। তাছাড়া ও এখানকার রাস্তাঘাট ও চেনেনা। " - এই বলে বাংলোর পেছনের জঙ্গলটার দিকে দৌড় দিয়েছিল পলাশ। সামান্য গভীরে যেতেই চোখে পড়ল লাবণ্যকে - একা একাই যেন মন্ত্রমুগ্ধর মতো কুয়াশাবৃত শালবনের মধ্যে হেটে বেড়াচ্ছিল সে।

"এই লাবণ্য, এই...." - পেছন থেকে ঠেলা মারতেই যেন হুস ফিরে এসেছিল তাঁর।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ.... পলাশ। তুমি এখানে। দেখো কি সুন্দর না জায়গাটা, কি সুন্দর ঘন শালবন, গাছে গাছে কত নামনাজানা পাখির কোলাহল, আর ঐযে সামনের দীঘিটা দেখো। " - লাবণ্য সম্মুখে আঙ্গুলিনির্দেশ করতেই চোখ পড়ল ঘন শালগাছের সারির মাঝে ছোট একটা দীঘির দিকে।

আশেপাশের ঘন জঙ্গলের কারণে সচরাচর দীঘিটার প্রতি দৃষ্টি অগোচর হওয়াই স্বাভাবিক।

"এই দীঘিটার কথা তুমি জানলে কিভাবে? " - সহসা প্রশ্ন করল পলাশ।

"ঐযে ঐ মেয়েটা দীঘির ধারে বসে বসে শিষ দিয়ে ডাকছিল আমায়। ওর ডাকে সারা দিতেই তো ঠিক খুঁজে খুঁজে চলে এলাম এখানে " - দীঘির দিকে তাকাতেই পলাশের সারা শরীর কেমন যেন শিউরে উঠল, মেয়ে কেন তারা দুজন বাদে আর কোনো প্রাণীরই অস্তিত্ব নেই দীঘির আশেপাশে।

"কোন মেয়ের কথা বলছো তুমি, লাবণ্য। ওখানে তো কেউ নেই " ধমকের সুরে বলল পলাশ।

"ঐতো ওখানেই তো বসেছিল এতক্ষন। আমি তাঁকে ডাকতে যাবো ঠিক সেইসময়ই তো তুমি চলে এলে, মনে হয় ও ভয় পেয়েছে তাই আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। " - কেমন যেন ছোট বাচ্চার মতো কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল লাবণ্যর।

সত্যিই কি তাহলে চারিধারের এই দুর্ভেদ্য কুয়াশার আড়ালেই গা ঢাকা দিয়ে আছে কেউ? মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল পলাশের।

সটান লাবণ্যের হাত ধরে টানতে টানতে বাংলোতে ফিরে এলো তারা। সারা রাস্তা লাবণ্য কেবল পেছনের সেই কুয়াশা মাখা শালবনের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে চলেছিল।

২ ।।

ডাক্তার মিশ্র বনদপ্তরেরই খণ্ডকালীন একজন ডাক্তার। সরকারী কর্মচারী ও কুলি মজুরদের কোনো অসুখ বিশুখ হলে তাঁর নামই স্মরণ করা হয়, বলতে গেলে।

পরদিন সকাল সকাল অযোধ্যার সদর থেকে পলাশ ডেকে এনেছিল তাঁকে। অযোধ্যা বনদপ্তরের সদ্য নিয়োজিত কর্মচারী বলেই হয়তো এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার মিশ্র।

"না, সামান্য জল -বায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐ একটু জ্বর এসেছে। ওষুধ লিখে যাচ্ছি কয়েকটা, তোমার কেয়ারটেকার কে দিয়ে আনিয়ে নিয়ো। এ ছাড়া তো আর কোনো বেগতিক লক্ষণ চোখে পড়ছেনা, মানসিক কোনো সমস্যাও তো চোখে পড়ছেনা ঠিক। " - লাবণ্যকে পরীক্ষা করার পর বলল ডাক্তার।

"কিন্তু এই নিয়ে পর পর দু দিন ও ঐ একই জায়গায় গিয়ে কাকে যেন খুঁজে যাচ্ছে। কেও নাকি ও শিষ দিয়ে ডাকছে। "

"তুমি শুনতে পাচ্ছ না সেই শিষের শব্দ? "

"না স্যার। আমারও ঘুম বেশ পাতলা। সেরকম কোনো শব্দ হলে তো অমিও শুনতে পাবো। তাছাড়া সেখানে গিয়েও তো আমি কাউকেই দেখতে পাচ্ছিনা। চারিদিকে এতো কুয়াশা, এর মধ্যে ঠিক পথ চিনে কিভাবে যে লাবণ্য পৌঁছে যাচ্ছে ঐ দীঘির ধারে..." - হঠাৎ আমার কথা থেমে গেল দরজার দিক থেকে আসা একটি বিস্ময়সূচক আর্তনাদে - "কি! দীঘি ...! "

দেখলাম কখন যেন রতন এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে।

"এই তুমি কিছু জানো নাকি এই দীঘিটার ব্যাপারে। তোমরা তো অনেকদিনই আছো এখানে " - প্রশ্ন করল ডাক্তার।

ডাক্তারের সটান প্রশ্নে যেন খানিক হকচকিয়ে গেল রতন।

"আজ্ঞে না, ডাক্তারবাবু। ঐ দীঘির ধারে নাকি এক জাহের থান আছে বটে। শুনেছি, ভারী জাগ্রত সেই বোঙ্গা। ঐ থানের জন্যেই বুধহয় জায়গাটোর নাম মারাংদীঘি " - এক নিঃশ্বাসে বলল রতন।

"এর বেশী কিছু জানিনা বটে আমি, বাবু "

"হমম। জঙ্গলের অতো গভীরে জাহের থান কেই বা প্রতিষ্ঠা করবে? তুমি দেখেছিলে কিছু, পলাশ? " বিজ্ঞের মতো একবার মাথা নাড়িয়ে প্রশ্ন করল ডাক্তার।

"এতো কুয়াশা স্যার, কিছুই তো দেখা যাচ্ছিল না। দীঘিটাকেই তো প্রথমে দেখতে পাইনি আমি, আর সেই থান তো দূরের কথা " স্বল্প হেসে জবাব দিল পলাশ।

"যাকগে, ওষুধ গুলো আনিয়ে নিয়ো কাউকে দিয়ে। আর কদিন একটু বিশ্রামে রেখো তোমার স্ত্রী কে, কোনোরকম মানসিক চাপ যেন না পড়ে। আসি তবে ..." -

বিদায় নিলেন ডাক্তার।

৩।।

পরের দিন থেকে পুরোদস্তুর কাজে লেগে পড়তে হলো পলাশ, যে কাজের জন্যে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে সেই কাজে ফাঁকি দিলে যে চরম বিপত্তি ঘটতে পারে তা সে ভালো ভাবেই জানতো।

অযোধ্যার দক্ষিণের জঙ্গলগুলির ফরেস্ট রেঞ্জারদের সাহায্য করাই ছিল পলাশের কাজ। কাজ,, আহামরি কিছু না হলেও সারাদিন উপস্থিত থাকতে হতো পলাশ কে সেখানে।

এদিকে লাবণ্য একেবারেই একা হয়ে গেল, সারাদিন বাংলোর বাগানেই ঘোরাঘুরি করে, বেড়ার বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই তাঁর। বাগানের মালি কাম দারোয়ান, মংলু দিন থেকে রাত তাঁকে চোখে চোখে রাখে। মংলু ছেলেটা এমনিতে বেশ কাজের, তবে রাত হলেই নাকি তুমুল নেশাভাঙ করে।

এমন ভাবেই কেটে গেল আরও দিন তিনেক।

তবে ক্রমেই লাবণ্যের শারীরিক অবস্থা যেন আরও অবনতির দিকে ঢলে পড়ল। প্রায়ই ভোর রাতের দিকে সে বিছানা ছেড়ে উঠে ছটপট করতে থাকে, সেই দীঘিতে যাবার জন্য যেন উতলা হয়ে ওঠে তাঁর মন, উন্মাদের ন্যায় হাত পা ছুড়তে থাকে। কোনোরকমে শারীরিক বল প্রয়োগ করে পলাশ আটকে রাখে

তাঁকে। বার বার লাবণ্য কেবলই আর্তনাদ করে ওঠে আর বলতে থাকে - "ও যে ডাকছে আমায়, যেতে হবে তো আমাকে ওর কাছে। ছেড়ে দাও বলছি আমায়...."।

পলাশ এটাও লক্ষ করেছে যে ঠিক দিনের ঐ সময়ে লাবণ্যের শরীরে যেন দানবিক কোনো শক্তি প্রবেশ করে। সে যেন অন্য কোনো মানুষে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এইরকম ঝুট ঝামেলা তে আরও দিন দু এক কেটে যাবার পর একদিন রতনকে কাছে পেয়ে পলাশ জিজ্ঞেস করে বসল - "এই সত্যি করে বলতো ঐ দীঘিতে কি এমন আছে?"

"বাবু, ওর নাম যে মুখেও আনতে নেই বটে । আর এর আগেও তুমাদের মতো অনেকেই এর শিকার হইছে। কিন্তু আমরা মুখ খুলিনি বাবু, মুখ খোলা যে বারণ বটে আমাদের।" ভীত স্বরে বলল রতন।

"কে বারণ করেছে মুখ খুলতে? এরকম ভাবে দিনের পর দিন মানুষটা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আর তুমি মুখ খুলবেনা বলছো। তোমরা মানুষ?" ধমক দিয়ে বলল পলাশ।

খানিক্ষন চুপ থেকে ফের বলে উঠল রতন - " ঐ জঙ্গলের ঐ দীঘিতে কুহেলী থাকে বটে "

"সেটা আবার কে? "

"সে এক ভয়ানক স্ত্রীন বটে বাবু। বীভৎস অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তাঁর। ঐ ভোরের কুয়াশাতেই তাঁর জনম, ওখানেই তাঁর মরণ। এ স্ত্রীন আমাদের বাপ্ দাদুদের সময় থেকে বাস করে ওখানে বাবু। এখেনকার কোনো লোক ওদিকে ভয়ে যায়না বটে। তবে এ গল্প যে বাইরের কুনো লোককে বলতে নাই, তাই আমরা মুখ খুলিনা বটে বাবু। ক্ষমা করবেন " - হাতজোড় করে বলল রতন।

"তা এই যুগে এসেও তোমরা লোককথায় বিশ্বাস করো দেখছি। তবে হ্যাঁ? এই কুয়াশা তো সারাবছর থাকেনা, কেবল এই শীতের মাসে। তো বছরের বাকি দিন গুলোতে তোমার এই কুহেলী কি নাক ডেকে ঘুমায়, হ্যাঁ? " - খুকখুক করে হেসে উঠল পলাশ।

"হ বাবু। কেবল এই শীতের সময়েই ও শিকার করতে বেরোয় "

"তা এই কুহেলী নামটাও বোধহয় তোমাদেরই দেওয়া না?" - হাসি চেপে বলল পলাশ।

"জানিনা বাবু। আমি তো জনম থেকেই শুনে আসছি। কে নাম দিয়েছে তা তো জানিনা বটে "

"যাও যাও তুমি নিজের কাজে যাও। যতসব গাঁজাখুঁড়ি লোককথা " - এই বলে বনদপ্তরের অফিসের দিকে রওনা দিয়েছিল পলাশ।

৪।।

রতনের কথাগুলো একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলেও মনের ভেতর একটা বিপদের আশঙ্কা বার বার কড়া নেড়ে যাচ্ছিল পলাশের। ভয়ঙ্কর কিছু যেন ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রই !

সেদিন পলাশের ফিরতে বেশ রাত হলো। ফিরেই লাবণ্যের খোঁজ করল সে - "লাবণ্য... লাবণ্য "

"এইযে, ঘরে..." - ঘরে ঢুকে দেখল লাবণ্য নিজের মনে একটা গল্পের বই পড়ছে। লাবণ্যের পড়াশোনা বেশীদূর না হলেও বিভিন্ন ধরণের বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসে সে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসার সময়েই তাই এক বস্তা নানা বিষয়ের বই নিয়ে এসেছিল সে।

"কি আর করবো, সময় কাটছিল না যে। তুমিও আজ এতো দেরি করলে..." - লাবণ্যেকে আজ এতটা সুস্থ দেখে মনে মনে বেশ খুশি হয়েছিল পলাশ। মনে হচ্ছিল আবার যেন সে তাঁর পুরোনো লাবণ্যেকে ফিরে পেয়েছে।

"কতদিন তোমার সাথে বসে গল্পগুজব করিনি বলতো " - এই পলাশ সটান লাবণ্যের পাশে গিয়ে বসে তাঁর হাতটি ধরল।

"ইশ.... আবার বাইরের কাপড় না ছেড়েই বিছানায় বসে... যাও " - এই বলে সটান নিজের হাত টা সরিয়ে নিল লাবণ্য।

তবে এই সকল খুনসুটি, মধুর মুহুর্ত পলাশের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী আর হলোনা। এইযে সুখের সংসার, সুখের চাকরি - সবকিছুই কেমন যেন ঘেঁটে গেল!

বিপদটা ঘটল সেদিন রাতেই।

তখন ভোর রাত। হঠাৎ বেজায় মশার জ্বালায় ঘুমটা ভেঙে গেল পলাশের, এ অঞ্চলে যে মশার ভারী উৎপাত তা এই কদিনেই টের পেয়েছিল সে। সহসা বা দিকে পাশ ফিরতেই আঁতকে উঠল সে, লাবণ্য বিছানায় নেই।

"লাবণ্য.... রতন... কোথায় তুমি? রতন...."- পাগলের মতো রতনের উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল পলাশ। "বলেন, বলেন দাদাবাবু " হতচকিত হয়ে পলাশের ডাক শুনে হাজির হলো রতন।

"লাবণ্য কই ? " - তখন উন্মাদের ন্যায় অবস্থা পলাশের।

"মংলু তো গেটে পাহারায় আছে বাবু, দিদিমুনি তো বেরোতে পারবেন না..." - তবে গেটের কাছে গিয়েই বুঁকের সমস্ত রক্ত যেন শুকিয়ে গেল পলাশের, গেট খোলা, সেখানে মংলুর কোনো চিহ্ন নেই।

"নিশ্চই ব্যাটা নেশা করে কোথাও পড়ে আছে, কাল আসুক ব্যাটারে মজা দেখাচ্ছি বটে..." - রতন বলে উঠল।

হঠাৎ গেটের নিচের দিকে নজর পড়ল পলাশের - সেখানে পড়ে আছে লাবণ্যর হাওয়াই- চটি জোড়ার মধ্যে একটি।

৫।।

'এ কি হলো আমার লাবণ্যের। জীবনে কোনোদিন তো এই অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার স্যাপারে বিশ্বাস করতে দেখিনি তাঁকে, অমিও কোনোদিন করিনি। তবে আজ হলো টা কি? আমি নাহয় অশিক্ষিত, কিন্তু লাবণ্য তো সারাদিন বইপত্তর নিয়েই থাকে - কই তাঁর মুখেও তো কোনোদিন এই এর কথা শুনিনি। পুরান ছাড়াও আরও আধ্যাত্মিক বই পড়ে সে, কোনোদিন তো এই অযোধ্যার জঙ্গলে বসবাসকারী অপদেবতা র কথা শুনিনি তাঁর মুখে.... তবে.... ' - ঊর্ধশ্বাসে শাল মহুয়ার জঙ্গল ভেদ করে ছুটছিল পলাশ। চতুর্দিকের দুর্ভেদ্য কুয়াশায় আশেপাশের প্রায় কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ যেন শাল গাছের সারির আড়াল থেকে নজর রাখছে তাঁর ওপর, একবার করে কেউ যেন সেই পুরু শ্বেতকায় কুজ্ঝটির পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার লুকিয়ে পড়ছে পর্দার আড়ালে। সে যেন এক নারকীয় লুকোচুরি।

"লাবণ্য.... কোথায় তুমি... লাবণ্য " - সুউচ্চ স্বরে ডেকে চলেছিল পলাশ, তাঁর কন্ঠনালী প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল কোনো এক অজানা আশঙ্কায়, তবুও প্রানপনে ডেকে চলেছিল সে।

নবোঢ়া স্ত্রী এর জন্য ব্যাকুলতায় থেকে থেকেই প্রবল বর্ষণধারা নেমে আসছিল তাঁর দুচোখ বেয়ে।

"হায় ঈশ্বর.... চুলোয় যাক আমার ফরেস্ট গার্ডের চাকরি, চুলোয় যাক সবকিছু, ফিরিয়ে দাও লাবণ্য কে। কে এই কুহেলী? সামান্য এক অপদেবতা? যার নাম এই ছোট্ট গ্রাম্য অঞ্চল ছাড়া আর কেউ জানেনা, যার সঠিক নাম ও কেউ জানেনা, তাঁকে ভয় পাচ্ছি আমি? হে ঈশ্বর...."- বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল পলাশ।

দৌড়ানো থামিয়ে বনের মাটিতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। তাঁর পা দুটিতে আর ক্ষমতা নেই, অচল হয়ে পড়েছে যেন সেগুলো।

"বেরিয়ে আয় সালা, কে আছিস! কে লুকিয়ে আছিস এই কুয়াশার আড়ালে.... বেরিয়ে আয় সাহস থাকলে... কেন লুকোচুরি খেলছিস আমার সাথে... আয় বেরিয়ে!! " - সহসা যেন একটা অদ্ভুত শব্দ কানে ঠেকল পলাশের।

শীতল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সাথে ভেসে আসছে আরেকটা শব্দ , কে বা কারা যেন আড়াল থেকে ফিসফিস করে কথা বলছে, কিছু গোপন আলোচনা করছে তারা, পলাশ কে নিয়েই কি? ক্রমেই ফিসফিস টা বা দিক থেকে ডানদিক, ডানদিক থেকে পেছন দিকে ঘুরপাক খেতে থাকল।

কোনো অশরীরী যেন পলাশেরই চারপাশে ঘুরে ঘুরে ফিসফিস করে অবোধ্য ভাষায় কিসব বলে বলেছে।

নিজেকে পাগল পাগল বোধ হতে লাগল পলাশের ... "কে, কে রে... সামনে আয় না, ভীতু কোথাকার, সামনে আয়.... আয়..." ছাড়া ছাড়া কিছু অসংলগ্ন কথা বলতে লাগল পলাশ।

এবার আরেকটা শব্দ কানে এল তাঁর, তীব্র এক শিষের শব্দ। ঠিক যেমনটা লাবণ্য বলতো। একেবারে পলাশের সম্মুখের শাল গাছের সারিটার আড়াল থেকে আসছে সেটা।

এবার সাহস করে উঠে দাড়ালো সে, ধীর পায়ে এগিয়ে চলল শিষ এর শব্দ লক্ষ করে, পেছনের সেই অচেনা ফিসফিস এখনো ঘুরে চলেছে বনের আনাচে কানাচে।

হঠাৎ সামনের শালগাছগুলির কাছে এসেই থমকে দাড়ালো পলাশ। এতো সেই জায়গা.... সেই মারাংদীঘি।

মনে মনেই সে বলল - "লাবণ্য কে যদি খুঁজে পাই তাহলে এখানেই পাবো.."।

সন্ত্রস্ত পায়ে দীঘির দিকে এগোতে থাকল সে। যতই সে এগোচ্ছে, শিষের শব্দ টা যেন আরও জোরালো ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁর তীব্র ছুঁচোলো শব্দে কানের পর্দাগুলি যেন ছিঁড়ে পড়ছিল পলাশের, কোনোরকমে কানে হাত দিয়ে দীঘির দিকে এগোতে থাকে সে।

"ঐতো , লাবণ্য... লাবণ্য.... আমি এসে গেছি লাবণ্য " - দীঘির এক পারে চোখ পড়তেই খেয়াল করল পলাশ। একটি নারীমূর্তি দীঘির জলে পা ডুবিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে দীঘির পারে। শিষের শব্দ টাও নির্ভুল সেখান থেকেই আসছে, অর্থাৎ সেই মূর্তিই শিষ দিয়ে চলেছে এতক্ষন ধরে।

"লাবণ্য... তুমি এখানে আবার কেন এসেছো লাবণ্য, কিগো শুনতে পাচ্ছ ? "- আকুল কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল পলাশ। ধীর পায়ে সে এগোতে থাকল নারীমূর্তিটির দিকে।

একেবারে কাছে চলে আসতেই মূর্তিটার কাঁধে হাত রেখে ডাকল পলাশ - " ওগো শুনতে পাচ্ছ না, এতক্ষন থেকে ডাকছি যে "। হঠাৎ সেই শিষের শব্দ থেমে গেল, সাথে সেই ফিসফিস ও। বায়ুমন্ডলে এখন কেবল বন্য বাতাসের শব্দ।

"লাবণ্য..."- পুনরায় ফিসফিসিয়ে ডাকল পলাশ।

এর পড়ে যেটা ঘটল তাঁর জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলনা পলাশ। বুকের সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে জমে হিম হয়ে গেল তাঁর, কথাবলার শক্তি টা যেন চোখের পলকে কেউ কেড়ে নিল তাঁর থেকে - হঠাৎ সম্মুখের সেই নারীমূর্তির মুন্ডখানি ঘুরে গেল পেছনে অর্থাৎ পলাশের দিকে, ধর রইল যেই কা সেই, ঘুরে গেল কেবল মুন্ডুটা। কি বীভৎস সেই দৃশ্য, সারা মুখে অজস্র ক্ষতচিহ্ন ও কাটাছেড়ার দাগ, কোথাও বা কাঁচের ছোট ছোট টুকরো গাঁথা রয়েছে, একটা চোখ যেন খুবলে নিয়েছে কেউ, কপালের এক গভীর ক্ষত থেকে গলা পচা এক মাংসপিন্ড লকলক করে ঝুলছে আর ঠিক যেন ভাটার আগুনের ন্যায় জ্বলছে তাঁর অপর চোখ টা, মুখে একটা কৃত্তিম ও পৈশাচিক হাসি।

"আমায় ডাকছিলিস...." - খ্যানখ্যানে স্বরে বলে উঠল মূর্তিটা।

হঠাৎ কোত্থেকে এক জোড়া দানবিক হাত যেন চেপে ধরল পলাশের গলা। শ্বাস নেওয়ার প্রানপন চেষ্টায় ছটফট করতে থাকল সে, এদিক ওদিক হাতপা ছুড়তে থাকল। আর প্রায় তাঁর মুখের সামনে সেই একই ভাবে হাসতে থাকল সেই নরকের অজ্ঞাত প্রাণীটি....

এইভাবে কেবল মিনিটখানেকই যুদ্ধ করতে পেরেছিল পলাশ নিজের প্রাণের সঙ্গে, জ্ঞান হারাবার পূর্বে শুধু একটা দৃশ্য অস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল সে - সেই পৈশাচিক প্রাণীটির পেছনে দীঘির কালচে জলে ভেসে উঠেছিল লাবণ্যের স্নিগ্ধ এবং প্রাণহীন দেহটি ....

ছোটগল্প

অভিন্ন

- সায়কদীপ দাস

- প্রেম কাকে বলে জানা ছিল না আমার। সারাজীবনই চারটে সাদা দেওয়ালের গন্ডির মধ্যে আমার বাস। মাঝে মাঝে সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, নীলচে টিউবলাইটের আলো দব-দব করে ওঠে। অক্লান্তভাবে ঘুলঘুলির পাখাটা ঘুরে চলে; লম্বা লম্বা ছায়ার দাগ কেটে যায় ঘরের মেঝে জুড়ে, আমার শক্ত করে এঁটে থাকা জ্যাকেটের ওপরও আঁচড় কেটে যায়। ছটফট করে গড়িয়ে পড়তাম আমি। নিজের চিন্তা আর বিশ্বাসের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাটলটা ত্বরান্বিত হয়। ভাবি, আমি কি সত্যিই পাগল? দিনরাত ওই লোকগুলো আমায় যেটুকু বলে সেটাই সত্যি? আমিই কি বিনা কারণে ছুরি চালাই? আমি আমার অস্তিত্বের জানানটুকু পেতাম না। কিন্তু, আর ভয় নেই— সে এখন রোজ আমাকে ঘুম পাড়াতে আসে। প্রত্যেকরাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর, যখন একদমই ঘুম আসেনা; দু'চোখ দিয়ে সবটুকু দেখতে পাই, তখন সে আসে। কৃষ্ণবর্ণা, এলোকেশী, দীর্ঘ-গড়ন; মেদহীন কোমর আন্দোলিত হয় প্রতি ছন্দে। আমি যে প্রেমের কিছুই জানি না, তার মনেও দু'টো লাইন জেগে ওঠে। ঘষটে-ঘষটে এগিয়ে যাই তার দিকে। তার দু'চোখে শান্ত, তপ্ত, বিধ্বংসী ভালোবাসা। আমার ক্লান্ত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে; নিজের কোলে মাথাটা নিয়ে রুক্ষ চুলে আলতো বিলি কেটে দেয়। সাদা রং-করা দেওয়ালের মাঝে তাকেই সর্বসম্পূর্ণা সত্য বলে বোধ হয়। নিঃশ্বাস শুনি; আমার ঠোঁটে উষ্ণ বাতাস লাগে; ফিসফিস করে প্রশ্ন ধরে, কতবার দোরগোড়ায় তার জন্য পথ চেয়ে বসেছিলাম? আমার উত্তর আসে না, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে; সোঁদা গন্ধ কেটে উগ্র কামিনীর মতো সে চেয়ে থাকে আমার দৃষ্টি বেয়ে। আঙুলের খুনসুটিতে ভালোবাসে আমায়, আলতো হাসির টান পড়ে তার। ঘুলঘুলির লম্বা লম্বা ছায়াগুলো বেয়ে ঘুম হাতছানি দেয়, দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু, সে আগলে রাখে।ভাবি, কবি কি একেই বলেছিলেন বনলতা সেন?

— রোজরাতে জেগে ওঠার আগে ঘুমিয়ে পড়ি, সমস্ত স্মৃতি আবছা হয়ে আসে; তারপর জেগে উঠি আবার। দেখি, কর্দমালিপ্ত একটা পিন্ড; মজ্জাহীন ভাবে পড়ে আছে; একই ঘরের মধ্যে; একই সাথে; কোনো অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই। নিজেই নিজেকে বেঁধে ফেলে জীবন্ত মৃতদেহ হয়ে বেঁচে আছে। তাই, আমি হেঁটে হেঁটে যাই। সাবধানে তুলে আনি তাকে। বহুবার অগ্রাহ্য করতে চেয়েছি, বহুবার প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু শেষে গিয়ে ভালোবেসে ফেলেছি; রাধার মতো, সতীর মতো, বহ্নিপতঙ্গের মতো, যেন পাগলের মতো।সযত্নে মাথাটা নিয়ে রাখি আমার কোলে। খসখসে, শুকনো চুলে অসহায়তার ছাপ, বিলি কাটি অবিন্যস্ত

সিঁথি জুড়ে। সাদা দেওয়ালে আর্তনাদের দাগ, তাকে পাগল প্রমাণ করার প্রবল আকাঙ্খা, ইচ্ছে করে সমস্তটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু, আমি অথর্ব। আমার ক্ষমতা নেই তাকে একফালি সরানোর। ফ্যানের ব্লেডের ছায়া আবার নখ বাগিয়ে আসে, কিন্তু আমায় দেখে কুঁকড়ে সরে যায়। আমার চুলের গন্ধে ভরে ওঠে চারিদিক। ওর ঠোঁটের কাছে নেমে আসি, আলতো স্বরে প্রশ্ন করি,

- "কতবার আমার জন্য তাকিয়ে বসেছিলে?"

উত্তর আসে না। কিন্তু, আবেশে তার চোখদুটো বুজে আসে। আমি তাকিয়ে থাকি ওর দু'চোখের দিকে। সমস্ত আদিমতম রূপে ভালোবাসবো, তাকে চোখে চোখেই বলে দি। বেচারা বেহুঁশের মতো তাকিয়ে থাকে। সারাদিনের অপেক্ষা শুধুই এইটুকু সময়ের জন্য। চিলতের মতো হাসি দাগ কাটে ঠোঁটে, আমিও প্রেমে পড়ে যাই। আঙুলের মুহুর্মুহু ছোঁয়ায় সে ঘন হয়ে আসে। সাদা, কৃত্রিম রং-করা ঘরের মধ্যে আমার অস্তিত্বটা প্রকট হয়ে মিশে যায় ওর ছায়ায়। নীল টিউবের আলোর তেজ কমে আসে। মধ্যরাতের প্রেমিকের সাথে আমার ভালোবাসা আবার জেগে ওঠে।

— দিস ইস দ্য কেস অফ এক্সট্রিম সিজোফ্রেনিয়া। পেশেন্ট পুরোপুরি এখন রিকোভারি প্রসেসের বাইরে। সে এই দুনিয়ার বাইরে নিজের একটা সুন্দর, আলাদা দুনিয়া বানিয়ে নিয়েছে। সেই দুনিয়ায় প্রতিরাতে তার কাছে তার প্রেমিকা আসে। দে মেক লাভ থ্রু আউট দ্য হোল নাইট! কিন্তু, এটা তার কোনো হ্যালুসিনেশন না। সত্যিই তার মন বা চেতনার একটা অংশ তার প্রেমিকা হয়ে ওঠে সেই সময়। সে নিজেই নিজেকে ভালোবাসে। মস্তিস্কপ্রসূত নয়, বরং নিজের অবয়বেরই এক অংশ তার কাছে আলাদা হয়ে, আলাদা রূপে আসে। নিজেকে বাইরে জগৎ থেকে ভুলিয়ে রাখার এক অস্বাভাবিক, ক্রুর পদক্ষেপ। কিন্তু, এটাই সত্যি। এখনও অবধি এরম ঘটনা মেডিকেল হিস্ট্রিতে বিরল, বরং প্রথম হলেও অবাক হবো না।একই মানুষের মধ্যে দুই ব্যক্তি, তারা একই সময়ে একসাথে যোগাযোগ করছে। নিজেকে ভালোবাসার এক অদ্ভুত, বেপরোয়া প্রচেষ্টা। আমার ওকে আর কিছু বলার নেই, অন্তত যদি সেই দুনিয়ায় সে দু'দন্ড শান্তি পায়, তাহলে সেই মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার নেই। আমার ক্ষমতা শুধুই এই কাগজ অবধিই- এক মানসিক রোগগ্রস্ত অপরাধীর রিপোর্ট। ব্যাস, বাকিটা চারটে দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকবে চিরকালের জন্য।

কলমে - সায়কদীপ দাস

ফোন নং - ৯৪৩২১২৯৪৪৩

আমাদের আবার দেখা হবে

- শতাক্ষী

স্থান : কলকাতা।তোর মনে পড়ে, সেই পুজোয় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে, তোর কাছে বায়না করে কোল্ড ড্রিংক খেতে চাইলাম? হঠাৎ হঠাৎ কেমন ছেলেমানুষী আব্দার বল? এদিকে তুই যখন নিজে কিছু কিনে দিতে চাইবি, কিছুতেই নেব না। সে আমার এক অদ্ভুত স্বভাব। শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি আর নিজেই হাসছি।

তোর ওপর আমার অধিকারবোধ বড্ড প্রবল, বরাবর। আমাদের সেই সব রাতের বকবক চ্যাটে যখন প্ল্যান করতাম তিন বছর পেরিয়ে গেছে দেখা হয়নি, এবার দেখা করতেই হবে, তখন লম্বা তালিকা বানাতাম। তোকে বলতাম, আমাকে প্রথমে বিরিয়ানি আর কাবাব খাওয়াতে হবে। তুই বলতিস, 'আচ্ছা'। তারপর রসগোল্লা খাব। বলতিস, 'বেশ'। তারপর আইসক্রিম খাব। তোর সম্মতি। তারপর যখন বলতাম, আমি পিৎজা আর ফ্রায়েড চিকেনও খাব, তুই বলতিস, 'পাগলী রে, তুই যা খাস জানা আছে, অত একদিনে খেতে পারবি না'। আমি বলতাম নাআআআ, খাবো, প্লিজ। তুই হেসে বলতিস, 'আচ্ছা যা প্রাণ চায় খাস'। তারপর আমার কী খেয়াল হত, বলতাম, আমাকে একটা কানের দুল কিনে দিতে হবে হাতিবাগান থেকে, কুন্দন ঝুমকো, দিবি তো? বলতিস, 'আচ্ছা দেব কিনে, যেটা তোর পছন্দ'। বলতাম আরও কত কী, তুই সবেতেই হাসতিস আর রাজি হতিস। আমি নিজেও জানি অত খেতে আমি পারব না, তবু তোর কাছে আব্দার করতে ভালো লাগতো এত! তোর কাছেই। বাবার পরে তুই একমাত্র পুরুষ, যার কাছে মুখ ফুটে চাইতে লজ্জা করেনি, দিব্যি চেয়েছি। আমার প্রেমিকদের কাছেও যা কখনো চাইনি, সঙ্কোচ হয়েছে। কিন্তু তুই, তুই যে সোলমেট আমার। তোর কাছে সবকিছু চাওয়া যায়, হাত পেতে বসে থাকা যায়। সেই রকম স্পেশাল দেখা আমাদের হয়ই নি বলতে গেলে, অত সময় হাতে নিয়ে। তবু রাতগুলোয় গল্পের ফাঁকে নানান কিছু চাইতাম তোর কাছে। বায়না করার প্রিয় একটা জানলা।

'অধিকার' শব্দটা বড্ড কঠিন রে, বড্ড ঝুঁকিপূর্ণ। কার ওপর যে কার অধিকার আছে, কার যে কার ওপরে অধিকার জন্মে যায়, তার হিসেব অঙ্ক কষে হয় না। তুই যখন প্রিয় বন্ধু থেকে আমার প্রেমিক হলি, অধিকারের মানদণ্ডে কোনও সংযোজন হয়নি। আগের মতোই নিঃসঙ্কোচ কুণ্ঠাহীন অধিকার তোর ওপরে। আসলে, অধিকার তো দৃশ্যমান বোঝা নয় যে চাপিয়ে দেব গাড়িতে, অধিকার কোনও মামুলি আগাছাও নয় যে নিজেই জন্ম নেবে; অধিকার একটা স্বতঃস্ফূর্ত উষ্ণ প্রস্রবণ যা আপনিই ঘনিয়ে ওঠে বিশেষ স্থানে হঠাৎ করেই। তোর মনে পড়ে, একটা সময় তোকে বলতাম, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাত্রী দেখে বিয়ে দেব তোর। তুই বিয়েতে রাজি ছিলি না, অন্য কাউকে গ্রহণে। এরপরে যেদিন তোর প্রেমে প্রথম আলো হলাম, তুই জিজ্ঞেস করেছিলি 'কিরে, এবার আর বিয়ে দিতে চাইবি অন্যের সঙ্গে?' এর আর উত্তর কী হয়। তবে বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তোর বউয়ের কথা ভাবি কিংবা নিজেই সে জায়গায় দাঁড়াই, তোর ওপরে অধিকার আমার সর্বাগ্রে এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। তুই আগে আমার, তারপর অন্যের, সোলমেটের ওপর অন্যের

দাবি কি মানা যায়? তুই বরাবর এসব শুনে হা হা করে হাসতিস আর আমাকে ক্ষেপিয়ে বলতিস, 'এই বাউন্ডুলের ওপর কেউ দরদাম করতে আসবে না, তোর সম্পত্তি তোরই থাকবে, নিশ্চিন্ত থাক। আমার ওপর তোর চিরন্তন অধিকার'।যা-ই বল, ওই কথাটায় সুখ ছিল ভরপুর, এক আকাশ আনন্দ। আমি জানতাম আমার একটা ঘর আছে, আমার একটা ঘর থাকবে। আজীবন, আমারই জন্যে।

কী সব আলতু ফালতু বকে যাচ্ছি বল? এসব কথা কি তোর অজানা নাকি তুই নতুন করে শুনতে চেয়েছিস আজ? তবু মনে হল বলি। ওই যে তোর প্রোফাইলে ছবি দিয়েছিস, একটা মেয়ের হাত হাতে নিয়ে, পাঁচ আঙুলের ফাঁকে পাঁচটা আঙুল, কি অবলীলায় আঁকড়ে আছে, ওই ছবিটা দেখার পর থেকেই এসব কেমন মনে পড়ছে। নিচের হাতটা আমি চিনি, তোর ওই ঘড়িটা আমার খুব পছন্দের ছিল। কিন্তু তোর হাতের ওপরে যে হাত, কতবার আয়নায় দেখলাম জানিস মিলিয়ে, সে হাতটা তো একদম আমার হাতের মতন নয়। কেন রে? কিসব ছবির ওই রেজোলিউশন না কিসব যেন, এদিক ওদিক করেছিস নাকি? অন্যরকম লাগছে কেন হাতটা? তোর হাতের ওপর হাত রাখার অধিকার, সে তো কেবল আমার। ওই আঙুলগুলো তবে কেন আমার মত নয়? হিসেব যে মিললো না এতদিন পরে। তবে কি... তবে কি হাতটা অন্য কারোর? তবে কি... তবে কি আজ ওই হাতটা আমি সরিয়ে দিতে পারি তোর হাতের ওপর থেকে? দাবি জানিয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাতটা স্থানচ্যুত করতে পারি? 'চিরন্তন অধিকার', আছে আমার? আজ?

তাহলে কি অধিকার হট ওয়াটার স্প্রিং নয়? অধিকার শুধু কোনও গরম জলের উপরিতলে ওঠা ওই বুদ্বুদটা যা নিমেষে মিলিয়ে যায়? জীবন আমাদের বড় বিভ্রান্ত করে রে, মাদারির খেল যেন, পলক ফেলতে এদিক ওদিক। যুক্তি, ব্যাখ্যা, ন্যায় কিচ্ছুটির ধার ধারে না জীবন। এ জীবনে সবই সম্ভব না রে? সবই আপেক্ষিক? অধিকার শব্দের শেষের ওই 'কার' অংশটার মত? যার উত্তর কেউ জানে না, শুধু বোকা বনে যায়!

কলমে : শতাক্ষী

ঠিকানা: কলকাতা

শূন্য

– রুদ্রান্তক (কিশোর দাস)

আমার নাম শূন্য, শুনলে একটু অবাক লাগতে পারে, তবে কাউকে বলতে আমার বেশ মজাই লাগে, দার্শনিক চিন্তার প্রেমভাবের চিন্হ হলাম আমি,সবসময়ই শুনে এসেছি ,নামের প্রভাব এ জীবন তৈরী, তাই আগে কুষ্ঠী দেখে নির্ণয় হতো,এখন বিভিন্ন জ্যোতিষ দেখিয়ে,সংখ্যাতত্ব, অক্ষরতত্ব দেখিয়ে হয়, আমার টা হয়ত তৈরী হয়েছিলো সত্যির সাথে বাস্তবের রসিকতায়, শূন্য,নিজের নামটাকে মাঝে মাঝে মন্ত্রের মত মনে হয়, শূন্য হলো উদাসীনতার চরম রূপ, ভগবান ও তো উদাসীন হতেই বলেছে, আমি আবার ঠিক উদাসীন না, চেহারাটা যদিও উদ্ভ্রান্ত এর মত লাগে, তবুও আমার সুখবোধ ভীষণ,পৃথিবীর সব কিছুকেই অভিজ্ঞতা ভাবার একটা স্বভাব আমার মধ্যে জন্মগত, সেটা ভালো না খারাপ জানি না, তবে এই স্বভাবের জন্যই বিপদ,দুঃখ সবই একটু উপভোগ্য হয়ে যায়,দুঃখ না হলে মদের ছোয়াতে ঠিক ঠিক সাহিত্য বেরোয় না,নিজের সম্পর্কে কথা বলতে ভালো লাগে না,আজ সেই নিজেকে নিয়েই লিখতে শুরু করেছি,তাই এত কথা আসছে, আসলে কোন একটা বইতে পড়লাম,প্রথম লেখা নিজেকে নিয়েই লিখতে হয়,তবেই আত্মমন্থনে বিষ আর অমৃত দুইয়েরই পরিচয় পাবে, আমি আবার ভেবেছিলাম তারপর কি হবে,রাহু হয়ে যাবো না তো, আমার একটু খেতে বেশি ভালো লাগে,তারপর আবার অসুর গণ, তবে হলে মন্দ হবে না, সূর্য্য খাওয়ার স্বাদ পাওয়া যাবে, না অনেক হলো,এবার একটু আমার আকৃতির পরিচয় দিয়ে দি, আমি 173 সেন্টিমিটার, একদম সাধারণ দেখতে, চুল চিরুনির বনবাস পর্ব বহুদিনের, শুধুমাত্র আঙ্গুল গুলোর প্রেম স্পর্শে এধার ওধার হয়, নিজের সাথে নিজের পরীক্ষা করা হচ্ছে আমার সবচেয়ে পছন্দের পছন্দ, আজকাল নতুন পরীক্ষা, কিছুতেই অবাক,ভয়,অথবা চমকানো যাবে না, নার্ভ কে পুরো নাইলন করে নিতে হব...

আজ মেঘলা আকাশ, আকাশ মেঘলা দেখলেই,কেনো যেন বেরোতে ইচ্ছা করে,মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজলে আত্মার ভার অনেকটা কমে যায়, বহু বছর হয়েছে বৃষ্টিতে হাটিনি, অভ্যাসগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি বদলায় আজকাল,এতে কি ভালো হচ্ছে না খারাপ ঠিক বুঝতে পারছি না, গল্পে রাস্তায় বেরোলে অনেক মানুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয়,কিন্তু এই একুশে সবই যেন কৃত্রিম, মানুষের ও প্রোগ্রামিং করা আছে, কার সাথে হাসবে,কার সাথে গম্ভীর, কাকে একবারেই অগ্রাহ্য, সব মাপা, তাই আজ ভাবছি একটা মুখোস ছাড়া মানুষ খুঁজবো,

চটিটা আজকেও খুঁজে পাচ্ছি না,চটিটার হয়ত আমার পায়ের তাচ্ছিল্য আর সহ্য হয়নি,তবে আমি বস্তুবাদী নই, তবে বস্তুর মাঝে প্রাণবাদী, আর এই প্রাণ চিরকাল বাকীদের ক্ষেত্রেই খুঁজে পাই, ভাবলাম খালি পায়েই বেরোনো যাক,আজ নতুন পরীক্ষা হবে,দেখবো কাদের কাদের নজর নিচু...

খালিপায়েই বেরোলাম,আসলে সন্ধে ঘনাচ্ছে,এই ক্ষণ, আরো সাহসের আগুনে ঘি প্রদান করলো, আর বহুদিন ধরে ভাবা একটা সাধারণ দিন কিভাবে স্মরণীয় করতে পারা যায় ,সেই প্রক্রিয়ার ও একটা প্রচেষ্টা হবে। সন্ধ্যার সময়,রবিবার,তাই রাস্তায় মানুষের ঢল, আমিও সেই ঢলে ঢুকে গেলাম, হাঁটছি তবে পাঞ্জাবি পরে

তাও শান্তিনিকেতন ধরনের,সেই জন্যই হয়ত,সবাই একবার করে দেখছে,আর দেখলেই দেখি তাদের দৃষ্টি আমার খালি পায়ের দিকেও যাচ্ছে,তবে সবই ক্ষনিকের জন্য, তবে পরিধান আমার জীর্ন না,তাই রাস্তার কুকুর গুলো এখনও কিছু বলে নি, নাহলে কুকুররাও খুব বিচারমূলক,তারা জীর্ণ পোশাকের ,এলোমেলো দেখতে,লোক দেখলেই তেড়ে আসে,কে জানে...তারাও হয়ত এই সমাজ প্রভাবে প্রভাবিত, আমেরিকা প্রথম পৃথিবীকে শিক্ষা দেয় যে,গরীব যে সেই চোর হতে পারে,যদিও নতুন সার্ভে অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি চুরি করে ধনীরা,কারণ তারা কর চুরি করে,তবু সার্ভের থেকেও বেশি আমাদের বিশ্বাস ...যে আলাদা সেই সন্দেহজনক, আর এটা শুধু মানুষের জন্য না,সব প্রাণীর ই,হতে পারে এটাও একটা animal instinct , আমি তবে লোকের তাকানো খুব উপভোগ করছি, কিন্তু বিচার করছি না, আসলে বিচার করতে গেলে উপভোগ করা যায় না, কোথায় যেনো পড়েছিলাম মন যখন আলো হয়ে যাবে,তখন সব কিছুতেই প্রসন্ন থাকবে, কারণ আলোক অশুচি বস্তুর ওপর পড়লেও অশুচি হয় না,আবার শুচি বস্তুর ওপর পড়লেও তার গুন বাড়ে না, আর এভাবেই বিচারহীনতা নতুন দৃষ্টি প্রদান করে। হাঁটতে হাটতে অনেকটুকুই চলে আসলাম, এই দিকটাতে কখনও আসিনি, অবশ্য শহরও নতুন আমার কাছে,চাকরি আমি কোনোটাই বেশিদিন করি না ,কারণ একজায়গায় বেধে থাকলে মনে শ্যাওলা ধরার ভয় থাকে। তাই এখন এই নতুন শহরে এসেছি, ক্ষমাপ্রার্থী,শহরের নাম বলতে পারবো না,একটা ডাক নাম দিয়ে দিচ্ছি,আসলে আমাদের শহর গুলোর ও ডাকনাম এর দরকার,তবেই এই শহরে প্রেম থাকবে। আমার এই নতুন শহরের নাম দিলাম 'মেলা'। কারণ এখানে পথে আমি অনেকবার হারিয়েছি,আর অনেক অজানা মানুষ কে নিজের বন্ধু করার সুযোগ ও পেয়েছি।

আজ মনে হয় আবার হারিয়ে গিয়েছি,ঘড়ি পড়া হয় না বলে সময়ের ঠিকানাও হারায়, অনেক রাত হয়েছে মনে হয়, জনশূন্য হয়ে গিয়েছে এই অজানা মাঠ। আমি বসে পড়লাম, আকাশ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন,মেঘ কেটে গিয়েছে,তারাদের মাঝে চাঁদ নায়কের মতো পোজ দিচ্ছে আর সাথে হালকা হাওয়া, আর কি চাই, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম,কিন্তু যেই কয়েকটা টান দিয়েছি, একটা গাড়ি বেশ জোরে মাঠে প্রবেশ করলো। আর বেশ কয়েকজন লোক লাঠি হাতে নেমে মাঠের দিকের ঝোপ গুলোর দিকে দৌড়ানো শুরু করলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওই ঝোপ গুলো থেকে জোড়ায় জোড়ায় মানুষ দৌড়ানো শুরু করেছে। আমি অবাক হয়ে পরিস্থিতি ভাবছি আর সিগারেট টানছি, হঠাৎ একজন এসে কলার ধরল আর বললো,"এই শালা ওঠ" ,ঝাঁকুনিতে সিগারেট টা ফেলে দিয়ে উঠে দাড়ালাম,বুঝলাম এরা পুলিশ। হাবিলদার আমাকে তার সাথে যেতে বললো,আমি ও নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হওয়ার আশায় রওনা দিলাম। বড় সাহেবের কাছে যেতেই ,বড় সাহেব বলে উঠলো,"কিরে আজকাল ফুর্তি করা শেষ হলো" আমি বললাম,"কি বলেন স্যার ,সবে দুই টান দিয়ে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করছিলাম তখনই আপনারা উঠিয়ে নিয়ে আসলেন" ,বড় সাহেব হেসে বলল,"বাকি প্রকৃতির আনন্দ থানা থেকে পেয়ে যাবি, রমেশ(হাবিলদার) ওঠা ব্যাটাকে গাড়িতে"। রমেশ আদেশ পেয়ে যেনো এখনই আমারই ঘাড় আবার ধরতে যাচ্ছিল,আমি তার আগেই গাড়িতে উঠে পড়লাম।

অন্য একজন হাবিলদার আরও একজনের কলার ধরে গাড়িতে ওঠালো আর বলে উঠলো,"সাহেব এরা খুব চালাক,আজকাল কান খাড়া করে রাখে,একটু গাড়ির শব্দ পেলেই ভাগার জন্য তৈরি থাকে, এই ব্যাটা একটু বেশি গিলেছে,তাই পালাতে পারে নি" বড় সাহেব আস্তে করে কিছু বললো,ঠিক শোনা গেলো না। তবে একটু পরেই রমেশ এসে আমাদের কে বললো যে যদি শ্রীঘরে না যাওয়ার ইচ্ছে থাকে,তাহলে হাজার টাকা করে দিতে হবে। আমার পাশে সদ্য বসে থাকা মাতাল মুচকি হেসে পকেট থেকে হাজার বার করে রমেশ কে দিয়ে

একটা টলতে টলতে সেলাম করে নেমে গেলো, ও অন্ধকার রাস্তাতেই গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে রওনা দিলো। আমি বললাম ,"দাদা টাকা তো নেই". রমেশ এতক্ষনে আমার পায়ের দিকে তাকিয়েছে, বললো,"খালি পায়ে কেনো?চপ্পল জোড়া কি ফেলে এসেছিস,আর দাদা না স্যার বল" আমি বললাম,"রমেশ স্যার খালি পায়ে এসেছিলাম, টাকা নেই,তাই চপ্পল কেনা হয়নি,খুব অসুবিধা হয় হাটতে,আপনি যদি দয়া করে কিনে দেন এক জোড়া" , রমেশ বললো," শুয়োরের বাচ্চা মশকরার জায়গা পাওনি,এক রাত জেলে কাটলেই সব মজা পেছন দিয়ে বেড় হবে"। বড় সাহেব অন্য হাবিলদার কে বলে উঠলো রানা গাড়ি স্টার্ট দিতে। গাড়ি পুলিশ স্টেশনে পৌঁছালে আমাকে বড় বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারটা । তাই ভাবছিলাম ক্ষিদে এতো পাওয়ার কারণ কি, আবার ভাবলাম জেলেও তো বিনামূল্যে খাবার দেয়।

বড় সাহেবের নির্দেশে বসলাম , উনি ভালো করে আপাদমস্তক দেখে বললেন," দেখেতো ভালো ঘরের মনে হচ্ছে,নাম কি আপনার?" আমি ভাবলাম তুই ছেড়ে এবার আপনি করে বলছেন,পরিস্থিতি মানুষের ব্যবহার ও সম্পূর্ন পাল্টিয়ে ফেলতে পারে সেটা অনুভব করলাম। বললাম,"স্যার ভালো ঘর খারাপ ঘর তো জানি না, ওটা তো সমাজ ঠিক করে, আর নাম হলো শুন্য"

"আপনি কি ইয়ার্কি করছেন,আসল নাম বলুন,নাহলে কিন্তু ফল আপনাকেই ভোগ করতে হবে"একটু রাগের সাথে বলে উঠলেন বড় বাবু

আমি একটু হালকা হেসে বললাম," ইয়ার্কি করছি না স্যার, উত্তরাধিকার সূত্রে এই একটিই পেয়েছি,বাকিদের থেকে একটু আলাদা,তবে আমার প্রিয়,সম্পূর্ন নাম শুন্য দে,বাবা বলতো,দে এসেছে দেবতা থেকে,আর শূন্যের থেকে বড়ো কোনো দেবতা নেই,তাই এই নাম"

কিছুক্ষন তাকিয়ে আমার বলা কথার হয়ত সত্যতা যাচাই হলো,তারপর বললেন,"ওখানে এতো রাতে কি করছিলেন,জানেন না ওখানে খারাপ কাজ হয়?" আমি বললাম," পৃথিবীর যত সুন্দর জায়গা আছে সেইগুলো নিয়েই তো বিবাদ স্যার,ভালো রা জায়গা ছেড়ে দিলে, খারাপের ভিড় হয়,আমি এই শহরে এসেছি কয়েক মাস হলো,আজকে বেড়িয়ে ছিলাম মানুষ দেখতে,কিন্তু প্রকৃতির মায়াতে জড়িয়ে পড়লাম, সুন্দর মাঠে বসে আকাশ দেখার ও যে সাজা হয়,তার আশঙ্কা করতে পারিনি"

কথা তো দেখছি ভালই বলেন, তো কাজ কি করেন?

কথাই আমার কাজ স্যার,লোক কে জ্ঞান দিয়ে যাই,একটু জ্যোতিষী ও করি,তবে হঠাৎ যদি ইচ্ছে হয় তবেই,যেমন আপনার ওপর মনে হচ্ছে কোনো একটা বিপদ আসতে চলেছে।

ওইসব গাঁজাখুরি কথা বলে কি ভাবছেন বিশ্বাস করবো? ওইসব সব জ্যোতিষী বলে,আমরা আইনের মানুষ,আমাদের ওপর তুকতাক কাজ করে না।

স্যার বিপদ যে কিছুক্ষন এর মধ্যেই আসবে বলে মনে হচ্ছে।

কেনো,আপনার কি উচুমহলে চেনাজানা,তবে এই পরিমল বসাক উচুমহলের পরোয়া করে না...

কথা শেষ না হতেই সাহেবের ফোনে একটি ফোন ঢুকলো, আর কথা বলতেই সাহেবের হাসি মুখ চিন্তায় আর ভয়ে ছেয়ে গেলো,লাফিয়ে নিজের চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন তিনি,রমেশ কে ডেকে গাড়ি বেড় করতে বললেন ,আর অন্য কনস্টেবলকে বললেন আমার ফোন নম্বর ও ঠিকানা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে। বলার পরই হন্তদন্ত হয়ে সাহেব বেড়িয়ে গেলেন। কি হলো ঠিক বুঝতে পারলাম না,না বেড়িয়ে পড়া যাক, অন্ধকারের ও কিছু গোপন গল্প থাকে,অন্ধকারে দৃশ্যগুলো ছায়াছবির মতই মনে হয়ে, ভাগ্যও হয়তো অন্ধকারে তৈরী হয়, তাই মানুষ দেখতে পায় না। ওটাই মনে হয় শুন্য, চিরন্তন। আর মাঝখানের নামতা মুহূর্তের গল্পতে হারিয়ে যায়। আজ অনেক নতুনের স্বাদ পেয়েছি,কিন্তু আবার সব হারিয়ে যাচ্ছে,উদাসীনতার বৃত্তাকার, জন্ম মৃত্যুর রহস্যকে আর রোমাঞ্চ দিতে পারছে না, থানার থেকে আবার একজোড়া চটি দিয়েছে, এটা ভালো ,শূন্যেরই প্রাপ্তি ঘটেছে ।।

কলমে -- রুদ্রান্তক (কিশোর দাস)

Address – Siliguri Junction, Pati colony,

Road no – 9, Post – Pradhan nagar,

District- Darjeeling

Phone no – 8697092763

জন্মাষ্টমী - একটি রচনা

– অর্পণ গোস্বামী

প্রথমতো

কোসচেনটা কমোন পড়েনি স্যার।

তাই রচনাটা তেমন ঘ্যাম হবে না।

আসলে কী হয়েচে জানেন স্যার, আপনি যদি সরসোতি পুজো নিয়ে রচনা দিতেন, আমি প্যান্ডেল, মাইক, ওনজুলি,

ওই ভিজে ভিজে ডাল মাখা লুচি, বাঁদাকপি, বোঁদে, তার ওপর হলুদ সাড়ি পরা মেয়ে ইস্কুলের ডালিংরা, এমনকি নোমনিত্তং মনত্র – এ সব নিয়ে জমিয়ে লিখে দিতাম। দুগগো পুজো দিলেও চলত, কি কিসমাসও।

কিন্তু জনমাসটমির কোনও সোয়াদই আমার জিভে নেই স্যার।

যাকগে, জনমাসটমি বিসয়ে যা জানি তা লিখছি। আগস্ট মাসে জনমাসটমির দিন সিকিসনো, বোধ হয় বড় দেবতা ছিলেন, তাঁর নিজের বংসে জনমো নেন।

কিন্তু তাঁর এক ভিলেন মামা, হেভি মিনিসটার ফিনিসটার হবে, নাম কংস, জোতিসী করে জেনেছিলেন যে, এই ভাগনে তাঁকে দুনিয়া থেকে সাফ করে দেবে। তখন তিনি নিজের গুন্ডা নিয়ে আসেন তাঁকে মারতে।

কিন্তু আমাদের হিরো সিসুটিকে তার আগেই রাতারাতি পাচার করে দেওয়া হয়েছিল অন্য কারোর বাড়িতে। বোধ হয় নন্দী বা নন্দ কেউ হবে। সেখানে তার বউ জসোদার কাছে তিনি বড় হতে থাকেন।

ভিলেন কংস খালি হাতে ফিরে গেলে আনন্দে সবাই মিলে ঝুলন উতসব করে।

ছেলেবেলা থেকেই সিকিসনো খুব চালু ছিলেন।

রান্নাঘরে তিনি মায়ের ফ্রিজ থেকে আমুল মাখন চুরি করে এককোনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতেন। চেলারাও ভাগ পেত।

ধরা পড়লে বলতেন ম্যায়নেহী মাখন খায়া। কি বিচ্চূ ছেলেরে বাবা! খেয়েছি কি খায়নি, কি বলছে বোঝার উপায় নেই।

জসোদার কাছে গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই নালিশ জানাতো সিকিসনোর নামে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের পেছনে লাগার সভাব ছিল তাঁর। ইতিমধ্যে সেই সিসু নানান রকম মারপিটে জড়িয়ে পড়ে।

ইস্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়ে মাঠে গরু ফরু চরায়। তখন মিড-ডে মিল চালু ছিল না তো, ফলে ইস্কুলে যাবার ইনটারেসও ছিলনা। সিসুটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা গুন্ডাদের ঠেঙিয়ে হেভি জনোপ্রিয় হয়ে ওঠেন, বিসেস করে কালীয়া নামে একটি খতরনাক গুন্ডাকে লেকের জলে চুবিয়েছিলেন বলে এলাকার জনসাধারণ তাঁকে নিজেদের পাড়ার দাদা বানিয়ে দেয়।

সেকালেও দাদাগিরি ছিল স্যার। আপনি সোলে দেখেছেন নিশ্চই। মনে পড়ে গব্বর সিং এর দলেও কালিয়া নামে একটা ডাকাত ছিল।

যাইহোক এই সময় খুব সম্ভবত তিনি ভুল করে একটা কাছিমও মেরেছিলেন। কিন্তু পরবত্তি কালে তিনি বিপন্নো জানোয়ারদের আর খুন করেননি।

যদিও ময়ূরের পালক ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। ওটা বোধ হয়ে নাচতে নাচতে ময়ূরের গা থেকে খসে পড়া পালক হবে, তিনি কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। যাই হোক, সিসুটি যতো বড় হতে লাগলো, তত তার জানবার ইচ্ছে বাড়তে লাগলো।

স্যার আপনারাই বলেন জানবার ইচ্ছে না থাকলে শেখা যায় না, গ্যান বাড়েনা।

তখনকার দিনে ইস্কুলে জিবনবিগ্যান পড়ানো হোত না তো। তাই নদিতে গয়লানীদের চান করা দেখার ইচ্ছে জাগলো তাঁর।

আর জলের মধ্যে পুরোটা দেখা যায় না বলে গয়লানীদের জামাকাপড় লুকিয়ে রেখে চুপি চুপি গাছে চড়ে তাদের চান দেখতে লাগলেন। সুরু থেকেই একটু মেয়ে ঘেসা ছিলেন।

উঠতি বয়েস তো, এ রকম ইচ্ছে জাগা সাভাবিক। যাই বলুন স্যার, তখনকার দিনের দেবতা বলে পার পেয়ে গেছেন তিনি।

আজকের দিনে আমরা অমন ভাবে দেখলে গোয়ালারা এসে আড়ং ধোলাই দিত।

মামা কংসের হাত থেকে বাঁচবার জন্নে এই ছেলেটি রাজ বংস থেকে গোয়ালা বংসে চলে আসায়, ওর এক মামিমাও গোয়ালার বউ হয়ে ওঠেন। সেই মামিমার নাম ছিল স্রিমতি রাধারাণি ঘোস, তাঁর সোয়ামীর নাম ছিল স্রি আই,এন ঘোস।

ওই বয়েসে কোনো কোনো ছেলে স্যার মাসিমা, মামিমা, বৌদির সঙ্গে একটু আধটু ইনটু-মিনটুতে জড়িয়ে পড়ে, মানে ওই গোঁপ গজানোর সময়টায়, বুঝতেই পারছেন স্যার। আপনারও তো সে বয়েস একসময় গেছে। সে সব এখানে লেখা যায় না।

কেননা লিখলেই তো আপনি নম্বর কাটবেন। তবে সুনেছি সিকিসনোর অনেকগুলো বউ ছিল। তখনকার দিনে আইনের বালাই তো ছিল না। যে যটা পারত বিয়ে করত। রামচন্দকে দেখুন, একটা বউকে নিয়েই কত ঝামেলা না পোয়াতে হয়েছিল জিবনে, সে জায়গায় সিকিসনো অতগুলো বউকে শুধু ম্যানেজ করেছিলেন বললে ঠিক হবে না, একেবারে টাইট করে রেখে দিয়েছিলেন। গুরু লোক, সরি দেবতা, পায়ের ধুলো নিতে হয়।

যাই হোক, সিকিসনোর এক সময়ে সংসারের পতি বেরাগ্য জাগে, ঠিক করেন চলে যাবেন উত্তরে হিমালয়ে। কিন্তু ট্রেনে যেতে যেতে ভুল করে কুরুখেততোরে নেমে পড়েন। তখন সেখানে মহাভারত বইটার সুটিং এর তোড়জোড় চলছিল।

ইচছে হলো তাঁর টিভি সিরিয়াল এ নামার। আমাদের কিসনোর গায়ের রঙ ময়লা ছিল বলে হিরো হতে পারেননি। হিরোর ডেরাইভার হয়ে যান। হেভি আওয়াজ দিয়ে সুটিং সুরু করেও যুধদো সুরু হলো না।কারণ কোনো লেখা হাতে না নিয়ে, কারোকে কিছু না জানিয়ে হটাত তিনি এমন হেভি ডায়লগ শুরু করে দেন যে সকলে বোম মেরে যায়।

যতদূর জানি, যুধদের মাঠে অনেকখন ধরে ডায়ালগ দিয়েছিলেন। সেই ডায়লগগুলো সব নিয়ে পরে নাকি একটা বইও ছাপা হয়। পোডিউসার ডিরেকটার ভালো লোক ছিলেন আর সিনেমার মাঠ বলে সে যাত্রায় সিকিসনো বেঁচে গিয়েছিলেন।

ক্রিকেট মাঠ হলে আমপায়ার খেলা ডিলে করার দরুন আই সি সির আইন দেখিয়ে টিমের ম্যাচ ফী কেটে নিত।

শুনেছি সিরিয়ালটা নাকি খুব হিট হয়েছিল। আপনি নিশ্চই দেখেছেন স্যার। আমার আবার ওসব পুরানের গাঁজাখুরি গপ্পোতে তেমন ইনটারেস নেই। শোনা যায় যে, ওই হিরোদের ফ্যামিলিতে বউ নিয়ে পোবলেমেও আমাদের সিকিসনো জড়িয়ে পড়েছিলেন।

মেয়েছেলের ব্যাপার আর সিকিসনো থাকবেন না, হতেই পারে না। সেই সব নিয়ে আমি বেশি লিখছি না। পাচটা ভাইয়ের একটা বউ, আবার সকলের সামনে তার শাড়ি নিয়ে টানাটানি। ফ্যামিলির কেচ্ছা স্যার, না ঘাঁটাই ভালো।

সিকিসনো, যিনি হিরোকে অত গ্যান দিলেন আর সেটা আলাদা বই হয়ে বেরুলো, কিন্তু সিকিসনোর বদলে গীতা নামে ছাপা হলো কেন জানিনা।

গীতা কার নাম ছিল স্যার? গীতা কি তবে মামিমা রাধার ছোট বোনের নাম ? তাহলে তো খুব হেভি হবে। এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল, কারণ সিকিসনোর সব ব্যাপারেই মেয়েছেলে থাকে কিনা। দেখেন নি স্যার, আজও জনমাসটমিতে পাড়ার ছেলেরা বারানদায় দাড়ানো মেয়েদের সামনে সিকিসনোর মত হিরো হবার জন্নে একে অপরের কাধে চেপে উচুতে বেধে রাখা দইয়ের হাড়ি ফাটায়।

কতলোক ভীড় করে তা দেখে। সে এক ফাটাফাটি ব্যাপার স্যার। যাই হোক জনমাসটমি ব্যাপারটা সিকিসনোর বাথডে, সারা দেশ খুব ধুমধাম করে মানে। ইস্কুল কোলেজ সব ছুটি থাকে সেদিন। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা দোয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গে।

আর কিছু লেখার নেই, এখানেই শেষ করি। বানান দু একটা তাড়াতাড়িতে ভুল হতে পারে। খমাঘেন্না করে পাস করিয়ে দেবেন স্যার। নমস্কার নেবেন , ভালো থাকবেন।

কলমে : অর্পন গোস্বামী

স্থান: নৈহাটি।

অনুগল্প

মাদার্স ডে

– গৌতম সাহা

ছোট্ট সায়ন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবাকে হারায়, বর্তমানে ওদের মা-ছেলের সংসার।অভাবের তাড়নায় সায়নের মা মানুষের বাড়িতে কাজ নেয়।এ জন্য সায়নের মনে বড্ড কষ্ট।সায়ন স্কুলে ভর্তি হয়।স্কুলের বন্ধুরা সায়নকে বলে এবার মাদার্স ডে-তে সায়ন ওর মা কে কি উপহার দেবে? সায়ন মাদার্স ডে বোঝে না, ও জানে ওর মা ওকে বড় করতে কত পরিশ্রম করে,সায়ন জানে ওর কোন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে ওর মাকে কোনও উপহার কিনে দেবে?তোতা সায়নের মা,ওকে বলে, তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আমাকে উপহার দিও। সায়নের আঁকার হাত খুব ভালো, ও ভাবে বড় হয়ে ও কোনও আর্ট কলেজে ভর্তি হবে।তোতা কানারা ব্যাংকে ঋনের জন্য ছোটাছুটি করে, মানুষের বাড়িতে কাজ করতে ভালো লাগে না,সে ভাবে একটা টোটো কিনে নিজে চালিয়ে স্বাধীনভাবে সায়নকে বড় করবে।

মাদার্স ডে-র আগে তোতা ঋণটা হাতে পায়,ও সায়নকে বলে এবার আমি মাদার্স ডে-তে তোমাকে উপহার দেবো, তুমি বন্ধুদের বলো তাদের সেইদিন আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ।সায়ন খুব খুশি হয়ে মাদার্স ডে-তে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে।তোতা তাদের পাঁঠার মাংস ভাত খাওয়ায়।সায়নের বন্ধুরা দেখে সায়নদের বাড়ির উঠোনে একটা নতুন টোটো, ওরা জানতে চাই টোটো-টা কাদের।সায়ন খুব গর্ব করে বলে, এটা আমার মা মাদার্স ডে-তে আমাকে উপহার দিয়েছে।সায়নের বন্ধুরা অবাক জানতে চায় কে চালাবে?তোর তো বাবা নেই।বাবা নেই তো কি হয়েছে, মা চালাবে।সায়নের বন্ধুরা এতে দমে যায়,ওরা চুপ করে থাকে।সায়নের মা স্টিয়ারিংয়ে বসে,ওর বন্ধুদের টোটোতে উঠে বসতে বলে,সায়নের বন্ধুরা হই হই করে টোটোতে চড়ে বসে আর সায়ন এক ছুটে কাগজ আর রং পেন্সিল নিয়ে এসে সুন্দর করে মা আর বন্ধুদের ছবি আঁকে।ওর বন্ধুরা বলে সায়নের মাদার্স ডে পালন সবচাইতে সেরা হয়েছে, ওরা সবাই টোটোতে চড়ে বেড়াতে বের হয়,সায়নের মা সায়নের আকাঁ ছবিটা বাঁধিয়ে এনে ওর হাতে দেয়।লাজুক মুখে মায়ের হাতে ছবিটা দিয়ে সায়ন বলে হ্যাপি মাদার্স ডে মা।ওর বন্ধুরা হাততালি দিয়ে হই হই করে ওঠে হ্যাপি মাদার্স ডে ফর সায়ন।

ভোঁওওওকাট্টা

– রাখী ভৌমিক

কাদের যেন সুর ভেসে আসে লাল-নীল পেটকাটি, চাঁদিয়াল, চৌখুপিগুলো পাল্লা দিচ্ছে আকাশে যেন রঙের মেলা আর তখনই অস্থিরতা বাড়ে...!মাথার ভেতরটা কেমন যেন দপদপ করে। নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে এক অন্য সত্ত্বা বেরিয়ে আসে।সব ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। রাগ কেবল রাগ আর অক্ষমতা ফুটে বের হয় অচেনা মনে হয় নিজেকে।খালি মনে পড়ে ধুপ করে একটা শব্দ একটা আর্তনাদ আর ফুলের মতো ছোট্ট একটা শরীর মাংসের দলা হয়ে পড়ে আছে নীরব নিথর হয়ে!জায়গাটা ঘন কালচে লাল রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, লাটাই ফেলে দৌড়ে এসে একটা মুখ ছাদের আলসেতে ঝুঁকে আছে পাথরবৎ!হইহই করে কারা যেন ছুটে আসছে... চিৎকার কান্না তারপর এক বুক শূন্যতা আর চিলেকোঠার ঘর।

নাহ, পাগল আখ্যা পেয়ে পড়াশোনাটা আর হয়েই উঠলো না।স্কুলে,রাস্তায়,আশেপাশে ছোট বাচ্চা দেখলেই তোলপাড় হয়, মাথার মধ্যে খালি ছয় বছরের ছোট বোনের আধো বুলিতে দাদা ডাক আর-" দাদা চল ঘুড়ি ওড়াই" তে থমকে থাকলো সমস্ত পৃথিবী। সেদিন যে সেই বনুকে ঘুড়ি ওড়ানো শেখাতে নিয়ে গেছিলো। তারপর...

তবুও এখনো কোনো নির্জন দুপুরে চিলেকোঠার বন্ধ ঘরের একমাত্র জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ানো দুটো কানে মাঝে মাঝেই আচমকা থেকে থেকে অতীত বেদনার স্মৃতি মনে করাতেই বুঝি সুর ওঠে ভোঁওওওকাট্টা...

কলমে - রাখী ভৌমিক

ফোন নং -৭০০৩২৯৬১৪৬

গল্পের নাম – ভোঁওওওকাট্টা

স্বপ্ন দেখার দিন

- তাপস কুমার রায়

একটি গ্রাম্য বালক খোলা মেঠো পথে খোলা মাঠে হাওয়ার সাথে কায় দুলিয়ে ছুঠছে। আকাশে কী অফুরন্ত হাওয়া! অবিশ্বাস্য দিকশুন্যতা , আহা! আকাশপানে দেখতে দেখতে সে দেখতে পেল একটা ঘুড়ি হাওয়ায় পাক খাচ্ছে। সে ওই ঘুড়িটা পাবার জন্য ছুটতে লাগলো।

ঘুড়িটা যত নিচে নামছে তত যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে অনু সাইজে পরিণত হয়ে বালকটিকে প্রদক্ষিন করতে লাগলো সেটা। বালকটি খপ করে ধরে ফেলল। সে কী দেখল জানেন ? সে দেখল একটা টিকিট। সিনেমার টিকিট , সে অবাক হলো। মনে তার আজন্ম বাসনা মরার আগে একবার হলেও সিনেমা সে দেখবে। এর জন্য তাকে শহরে আসতে হবে।

সে হাঁটতে লাগল অনেক দূর , পেছনে সব পরিচিত গাছ ফেলে এসেছে, সম্মুখে অপরিচিতরাও আস্তে আস্তে পেছনে চলে যাবে , মনে নেই ওই দিনটা কি বার ছিল , সময় যেন নির্বিকার। সে বাসে চাপলো, তারপর ট্রেনে, আবার কোন বাসে এবং আরও খানিক হেঁটে।

এভাবে যখন শহরে পৌছলো তখন সে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা ফেলেছে , গোঁফের রেখা স্পষ্ট। জীর্ণ জামা শীর্ণ কায়া তবু উজ্বল চোখে সে দেখতে পেলো পুরাতন এক সিনেমাহল। ফুঁটো হওয়া বুক পকেট থেকে ছিন্ন টিকিটখানা বের করে সে হলে প্রবেশ করলো। সে অবাক হলো।

কোথায় কি !

হলের পেছনদিকটা নেই , ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সর্বত্র ভাঙা দেয়াল আর ভাঙা ইটের স্তুপ । গভীরে একরাশ জিজ্ঞাসা চিহ্ন ।

স্তুপের সারি পেরিয়ে সে হাঁটতে লাগলো , ধূলোয় সব আবছা, দেখতে পেলো অনেকগুলি মানুষ আর অনেকগুলো ক্যামেরা এদিক ওদিক মুভ করছে এবং ক্যামেরার সামনে অনেক প্রকারের অভিনেতারা কথা কইছে, নাচছে লাফাচ্ছে। অনেকক্ষন ধরে সে সেগুলো দেখলো অনুভব করলো, কখনও কখনও সেই দৃশ্য গুলির অংশ হয়ে পড়লো।

এমন করে সে নিজেও বুঝল না যে কখন সে স্টার হয়ে গেছে । নাম প্রতিপত্তি , অসংখ্য ভক্ত , এবং ব্যস্ততা। কি করে যেন তার বাড়ি গাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বাড়িতে সব হারানোর ছাপ , দীর্ঘ এক ব্যর্থ জীবনের ছাপ।

তার কিছুতেই ভালো লাগলো না , সে ফিরে যেতে চায় , কিন্তু পারছে না , সফলতা আর ব্যর্থতা একাধারে টেনে ধরে আছে যেন। সে চিৎকার করে উঠবে ভাবলো , তাও পারলো না। তখন সে দশ

তলার ছাদ থেকে মারলো এক লাফ ! হাওয়ায় পাক খেতে খেতে যত নিচে নামতে লাগল ততই যেন সে ছোট হতে থাকলো। ছোট হতে হতে মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তে সব ব্ল্যাক আউট হয়ে গিয়ে তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখলো খোলা মাঠে আকাশপানে তাকিয়ে সে শুয়ে আছে।

কলমে - তাপস কুমার রায়

দূরভাষ নম্বর – ৮২৪০৫৬১৪৮১

বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা

যত্নে অযত্নে সৌভিক

- নিরুত্তর

৫ বছরের সৌভিক আজও শিক্ষা দিয়ে চলেছে মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীদের। সময় পেরিয়ে গেলেও বয়সটা তার ৫ বছরেই থমকে রয়েছে। সৌভিক এনআরএস মেডিকেল কলেজে সাড়ম্বরের সহিত আদরে ও যত্নে রয়েছে। কে এই সৌভিক ?

এনআরএস মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে বাঁদিকের একটি ক্লাসরুম। সেখানে রয়েছে দুটি নরকঙ্কাল। একটি পূর্ণবয়স্কর আর একটি রয়েছে ছোট একটি শিশুর। পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কালটি কাঁচের বাক্সে বন্দি নয়। কিন্তু শিশুদেহের কঙ্কালটি কাঁচের বাক্সে বন্দি। সেই বাক্সের ঠিক উপরেই চোখ মেললেই দেখা যাবে শিশুটির ছবি। ছবিটির দিকে তাকালেই মনে হবে শিশুটি আপনাদের দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে। কিছু বলতে চাইছে সে। শিশুটির দুটি চোখ তাঁর যন্ত্রণার ইতিহাস ব্যক্ত করছে। বাক্সবন্দি শিশুদেহের কঙ্কালের ঠিক পিছনেই রয়েছে একটি লেখা। লেখাটিতে রয়েছে হৃদয় বিগলতি কিছু কথা।

শিশুদেহের এই কঙ্কালটি সৌভিক সামন্তের। আসানসোলের বাসিন্দা সে। সালটা ১৯৯৮, ২৯শে অক্টোবর পরিবারকে ছেড়ে চলে যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫ বছর। কাঁচের বাক্সের উপরেই সৌভিকের জন্মসাল ও মৃত্যু সাল লেখা রয়েছে। কি কারণে ছেড়ে চলে যেতে হল তাঁকে।

অসুখ নিয়ে কলকাতায় আসে সৌভিক তার বাবার সঙ্গে। তারপর আর কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়নি তাঁকে। এনআরএস মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছে সৌভিক সামন্ত। বলা যেতেই পারে ২৪ বছর ধরে সৌভিক সামন্তের কঙ্কাল অ্যানাটমি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্ণয় করার জন্য এনআরএস পড়ুয়াদের একমাত্র ভরসা। সাধারণ ভাবে পূর্ণবয়স্ক মানব কঙ্কাল পড়াশোনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনও বাচ্চার কঙ্কাল ব্যবহার করা হয়না। সেটি বই এবং মডেল থেকে পড়ানো হয়। কিন্তু এনআরএস এর ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণবয়স্ক কঙ্কালের পাশাপাশি ৫ বছরের শিশু কঙ্কাল লাইভ দেখে পড়াশোনা করছে। অসুখ সারাতে এসে কলকাতা তাঁর প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। সে চেয়েছিল কলকাতাতেই থেকে যাবে।

সেই স্বপ্নই পূরণ করল তাঁর বাবা। ছেলের মৃত্যুর পর সৌভিকের দেহদান করে দেন তিনি। তারপর থেকেই কলকাতাতে থেকে গেল সৌভিক। অঙ্গদান দিবসের পাশাপাশি সৌভিকের জন্ম ও মৃত্যুদিনেও তাঁকে স্মরণ করা হয়। সৌভিক এখন এনআরএস হাসপাতালের সম্পত্তি।

কলমে ঃ নিরুত্তর

স্থান : কলকাতা ।

<u>বিভিন্ন শরের ভিন্ন স্বর</u>

- শুভদীপ ঘোষ

হিন্দুদের পুরাণাদি শাস্ত্রে, বিশেষত ভারতের দুই অবিস্মরণীয় মহাকাব্য - রামায়ণ ও মহাভারতে তীর ধনুক তথা তীরন্দাজদের প্রাধান্য অনেকটাই বেশি। ভারতের প্রাচীন কাব্যাদির নিরিখে অন্যান্য অস্ত্র (যেমন, তরবারি, গদা, বর্শা, পরিঘ, পরশু প্রভৃতি) অস্ত্রের তুলনায় এর মূল্য অনেকগুণেই বেশি ছিল ।

রামায়ণে নায়ক রাম , লক্ষ্মণ ও প্রতিনায়ক রাবণ , মেঘনাদ তীর ধনুক নিয়েই যুদ্ধ করেছেন। আর দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রে নিতান্তই আতান্তরে না পড়লে কোনো যোদ্ধাই তীর ধনুক ছাড়া অন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি। তাতে তিনি গদাধারী ভীম, দুর্যোধনই হোন বা তরবারী যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ চিত্রযোধী নকুল সহদেবেই হোন না কেন তীর ধনুক দিয়ে সবাই যুদ্ধ করেছেন। এতে তীরন্দাজ ও তাঁদের অস্ত্রের কৌলিন্য কিছুটা বাড়ে বৈকি ।

তীরন্দাজদের যুদ্ধে সর্বপ্রধান শক্তি হচ্ছে তাদের তীর। তীর উত্তম হলে সহজেই একজন তীরন্দাজ লক্ষ্য ভেদ করে। ধনুর্বেদে তীরের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তীর বেশি মোটা কিংবা খুব সরু হবে না - ন স্থূলং ন যাতি সুক্ষ্মশ্চ। তীরগুলি দুহাতের বেশি লম্বা ও এক আঙুলের বেশি চওড়া কোনো ভাবেই হবে না।
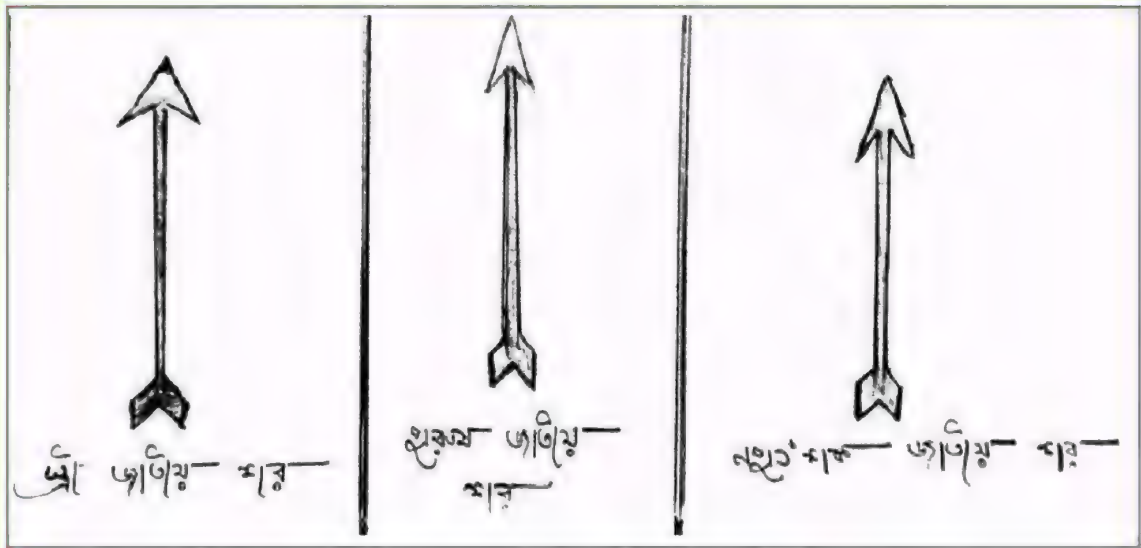
চিত্র : স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জাতীয় তীর

তৎকালীন দিনে শরে কাক, হাঁস, বক, মাছরাঙা প্রভৃতি বিভিন্ন পাখির পালক লাগানো হতো , যাতে বাতাসের বাধাকে কাটিয়ে সোজা যেতে পারে। ধনুর্বেদ অনুযায়ী প্রতিটি শরে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চারটি করে পালক লাগানো হত - এ কৈকস্য সয়স্মৈব চতুঃপক্ষাণি যোজয়েৎ।

এরপর আমার তীরের প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত।

বাণের স্থুলতা ও সুক্ষ্মতা বিচার করে প্রাচীন অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা তীরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন —

যে শরের অগ্রভাগ মোটা ও পুঙ্খভাগ ক্রমশ সরু হয়ে আসে সেইরূপ শরকে 'স্ত্রী জাতীয় শর' বলা হয়।

এই প্রকারের অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়। দু জন বিখ্যাত ধনুর্ধারীর যুদ্ধে এই তীর বেশি ব্যাবহার করা হয়।

যে শরের অগ্রভাগ সরু কিন্তু নিম্নভাগ পুঙ্খদেশ পর্যন্ত ক্রমশ মোটা হতে থাকে সেই তীরগুলিকে 'পুরুষ জাতীয় শর' বলা হয়।

এইপ্রকার তীর সবচেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারে। দূরবর্তী কোনো বস্তুকে এই তীর সহজেই আঘাত করতে পারে।
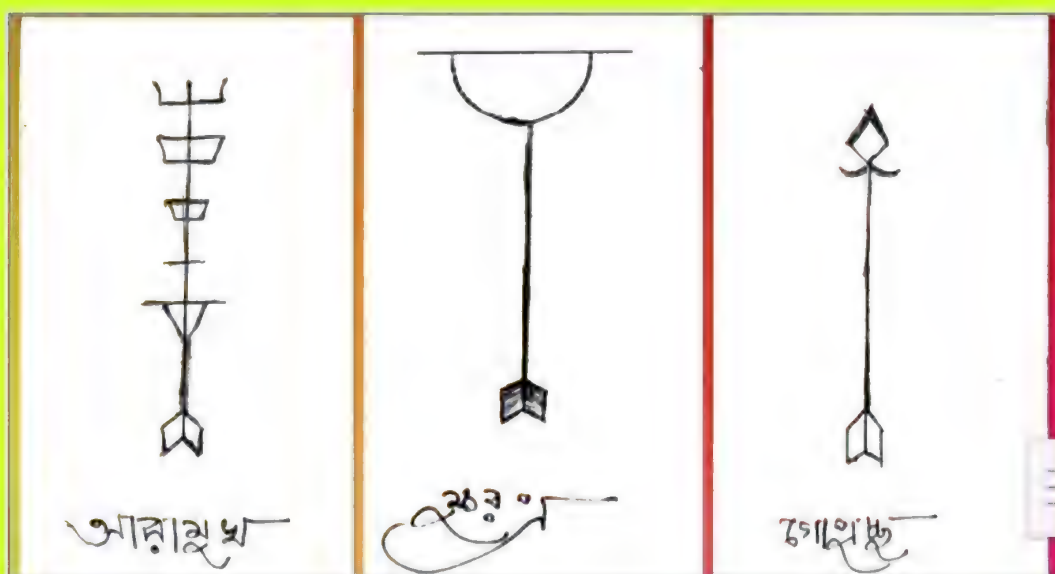
চিত্র : আরামুখ,ক্ষুরপ্র ও গোপুচ্ছ তীর

যে শরের অগ্রভাগ ও পুঙ্খদেশ সমান হয় সেই সমস্ত তীরগুলিকে 'নপুংসক জাতীয় তীর' বলা হয়।

লক্ষ্য ভেদে এই প্রকার তীরের জুড়ি মেলা ভার। মূলত সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানতেই এই তীর ব্যবহার করা হত।

তীরের ফলার আকার আকৃতির উপর নির্ভর করে সেই তীরের কাজ মূলত নির্ধারিত হয়। এই গঠন অনুযায়ী তীর বেশ কয়েক রকমের হয়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই সব তীরের কথা বারবার উঠে এসেছে। এরকম ভিন্ন ভিন্ন ফলাযুক্ত বহু তীরের উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহৎ শার্ঙ্গ সংহিতায় —

আরামুখং ক্ষুরপ্রঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।

সূচীমুখঞ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদন্তং দ্বিভল্লকম্।।

কর্ণিকং কাকতুন্ডশ্চ তমান্যদ্যান্যনেকশঃ।

ফলানি দেশে দেশেষু ভবন্তি বহুরূপত।।

বঙ্গানুবাদ: আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল ,কর্ণিক,কাকতুন্ড প্রভৃতি বহুবিধ নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারের ফলা আছে।

এই সমস্ত তীরগুলো শুধু নামের পার্থক্যই ছিল না। এরা আলাদা আলাদা কাজের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হত ।
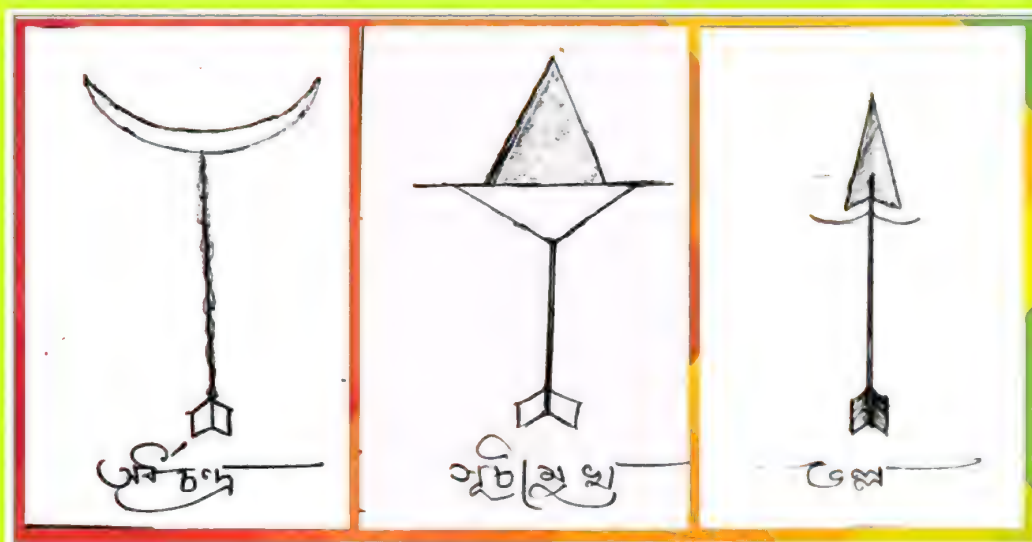
চিত্র : অর্ধচন্দ্র, সূচিমুখ ও ভল্ল

আরামুখ : এইরূপ বাণ দ্বারা সচরাচর মানুষ মারা যেত না। চামড়াকে ভেদ করে শত্রু শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করত এই তীর। কবচ, সাঁজোয়া , প্রতিপক্ষের ঢাল ও অন্যান্য আত্মরক্ষা মূলক জিনিসগুলোকেই এই তীর বিনষ্ট করত ।

ক্ষুরপ্র : এইরূপ বাণের সামনের দিক খুবই ধারালো হত ফলে এই তীরের দ্বারা সহজেই বিপক্ষ যোদ্ধার ধনুক ও হাত এবং মস্তক ছেদন করা যেত।

গোপুচ্ছ : এই তীক্ষ্মাগ্র বাণ সরাসরি গিয়ে শত্রুকে আঘাত করে ঘায়েল করত।

অর্ধচন্দ্র : চাঁদের বাঁকা ফালির ন্যায় দেখতে এই তীরের বাইরের অংশ অতিশয় ধারালো হত । তাই এর দ্বারা সহজেই প্রতিযোদ্ধার হাত ও গলা কেটে ফেলে তাকে বধ করা যেত।

সূচীমুখ : এই তীরের মুখ অত্যন্ত তীক্ষ্ম প্রকৃতির হওয়ায় বিপক্ষ যোদ্ধার বর্ম ও ঢাল বিনষ্ট করতে এর জুড়ি মেলা ভার ছিল।

ভল্ল : এই তীর দীর্ঘ্য , সরু ও অত্যন্ত তীক্ষ্ম হওয়ায় এটি সোজা প্রতিপক্ষের বুকে জোরে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখতো।

বৎসদন্ত : বাছুরের ছোট ছোট দাঁতের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এই তীর মূলত বিপক্ষের ধনুকের ছিলা বিনষ্ট করতে প্রয়োজন হতো। তবে এর দ্বারা ধ্বজাদিও ছিন্ন করা যেত।

দ্বিভল্ল : দুটি তীক্ষ্ম ফলা দিয়ে তৈরি হতো এই শর। প্রতিপক্ষের দিক থেকে ছুটে আসা বাণ প্রতিরোধ করতে মূলত এই তীর ব্যবহার করা হতো।
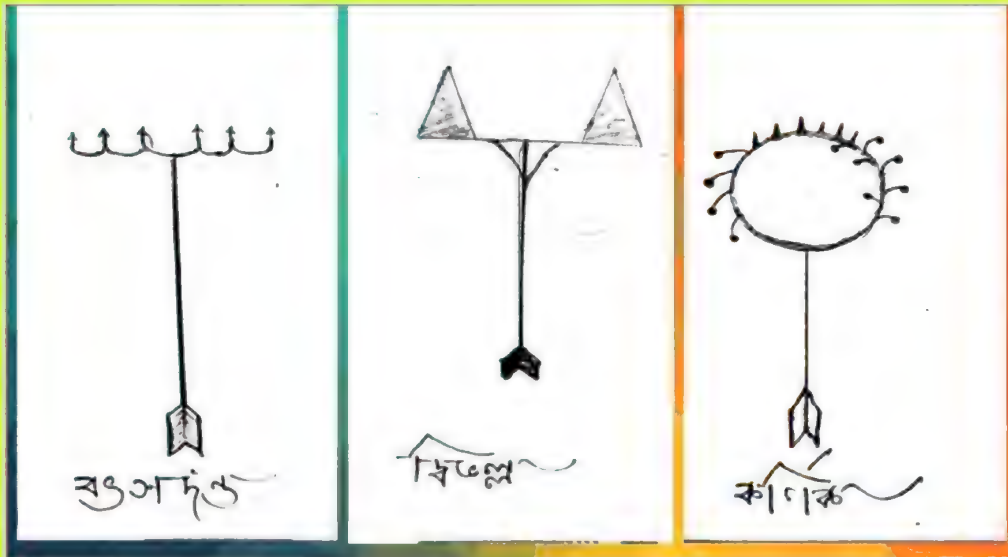
চিত্র : বৎসদন্ত , দ্বিভল্ল ও কর্ণিক (কর্ণি) বাণ

কর্ণিক : এই তীরের অগ্রভাগ তীক্ষ্ম হয় না বরং গোলাকার অগ্রভাগে ধারালো ব্লেড বসানো থাকে। প্রতিপক্ষের লোহার তীরকেও এই টির কেটে ফেলতে পারতো। শরীরে এই তীর লাগলে সেই অংশের চামড়া উঠিয়ে নিত।

কাকতুন্ড : কলস আকৃতির অগ্রভাগ যুক্ত এই ধারালো তীর প্রায় তিন আঙ্গুল সমান গভীর ও বিস্তৃত ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়াও পৌরাণিক ভারতের যুদ্ধবর্ণনায় আরো অনেক তীরের নাম উঠে এসেছে বহুবার।সে যুগের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অস্ত্রই ছিল তীর - ধনুক। প্রধান ভালো ও দক্ষ তীরন্দাজের হাতে

উত্তম তীর সর্বদাই তাঁর ও তাঁর দলের জন্য বাড়তি আশা দেবে যুদ্ধ জয়ের জন্য সেটা আর

আশ্চর্যের কি ? যন্ত্রমুক্তম্ তীর প্রাচীন ভারতের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে কতটা ভূমিকা রাখত তা

বলার অপেক্ষা রাখেনা নিশ্চয়ই।

তথ্যসূত্র : বশিষ্ঠ ধনুর্বেদ

বৃহৎ শার্ঙ্গ সংহিতা

আগ্নেয় ধনুর্বেদ

কামকন্দীয় নীতিসার

শুক্রনীতি

কলমে – শুভদীপ ঘোষ

ফোন নং – ৯৮৮৮৮৩৬৮৩৭৯৩

কবিতা

শরতের কথা

– সুস্মিত সাহা

শরৎ মানে দূর আকাশে

সাদা মেঘের ভেলা।

শরৎ মানে মাঠের মাঝে

কাশ ফুলের মেলা।

শরৎ মানে নীলাম্বরী শাড়ির

নকশাকাটা আঁচল;

শরৎ মানে চোখের নীচে

সরু রেখার কাজল।

শরৎ মানে নদীর জলে

নরম রোদের ছায়া,

শরৎ মানে মেঘের চোখে

ব্যাকুলতার মায়া!

শরৎ মানে গাছের তলায়

শিউলি ফুলের রাশি;

শরৎ মানে মনের ঘরে

তীক্ষ্ণ মধুর বাঁশি।

শরৎ মানে আশার আলো

মেঘের নীচে ঘরে ,

শরৎ মানে মেঘের চাদর

নীল আকাশের 'পরে।

কলমে - সুস্মিত সাহা

ফোন নং - ৯৪৫৬৮৭৩২৪৬

বৃষ্টি

– সায়কদীপ দাস

বলোনা বৃষ্টি,

সন্ধ্যের ফাঁকে, মৃত গোধূলির

শেষ নিঃশ্বাসে, অগুন্তি ঝাঁক

বাতাসের খেলো এলো চুল ঘিরে

কেন বিদিশার দিয়েছ ডাক?

বলোনা বৃষ্টি,

ভোরের আকাশে, মেঘমল্লার করে

তানসেন নই, তবু প্রেমিক হয়ে

আঘ্রাণে ভেজা সবুজ জড়িয়ে

ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শিশির হয়ে

কেমনে বেঁধেছ আমার রাগ?

বলোনা বৃষ্টি,

মধ্যরাতে, শ্রাবণমাসে

সুর শীৎকার, বজ্রনিনাদ

অঝোরে তোমার অতো কোলাহল

বুঝিনা আমি, মিথ্যে ছল!

বলোনা বৃষ্টি

সূর্য আকাশে, কৃষ্ণ আবেশে

ঢেকে আসে দিক, তীক্ষ্ণ বাতাস

বন্য-ক্ষিপ্ত লেলিহান যেন

আফিমের মতো নেশাগ্রস্ত

ছুঁয়ে যেতে যায় ওষ্ঠ-অধরে।

উন্মাদ তুমি আমার শ্বাসেতে।

বলোনা বৃষ্টি, কেন বারবার

প্রশ্নের শেষে উত্তর জুড়ে

নীরবতা রাখো?

বলোনা বৃষ্টি?

কলমে - সায়কদীপ দাস

ফোন নং - 9432129443

ভবঘুরে জীবন

- ঈপ্সিতা সাহা

ভবঘুরে জীবনের ছন্দ

চোখের জলের ভালো মন্দ

ভবঘুরে জীবনের সুর

ভাঙা দুঃখে ভরপুর

ভবঘুরে জীবনের স্বাদ

টক -ঝাল -মিষ্টি কি বাদ?

ভবঘুরে জীবনের গল্প

রহস্যের ঘন ছায়া অল্প !

ভবঘুরে জীবনের গতি

হিসাবের সব লাভ ক্ষতি !

ভবঘুরে জীবনের আশা

অখন্ড গাঢ় ভালোবাসা ।

ভবঘুরে জীবনের রাশি

ধারালো মুখের হাসি ;

ভবঘুরে জীবনের বিশ্বাস

অন্তিম দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস

ভবঘুরে জীবনের খেলা

নানান রঙের মস্ত মেলা ।

ভবঘুরে জীবনের গান

মনের সুপ্ত অভিমান ।

কলমে - ঈপ্সিতা সাহা

ফোন নং- ৯৪৫৬৩৪৮০২৪

কবিতার নাম - ভবঘুরে জীবন

প্রেমিক

– সৌগত খাঁ

তুমি যদি আমাকে বল

আমি প্রেমিক নই

ভালোবাসি না তোমায়

নতশিরে সেই মিথ্যাচার

মেনে নেব।

কিন্তু তারপর.....

দুটি শালিক একসাথে বসবে না

সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত এত সুন্দর হবে না

আকাশও সুন্দর হবে না।

কবিরা বন্ধ করবে কবিতা লেখা

গ্রামের মেঠো পথের

সোঁদা মাটির গন্ধটা যাবে উবে

লজ্জায় মুখ ঢাকবে চাঁদ

বসন্ত বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে

স্তব্ধ হয়ে যাবে দখিনা বাতাস।

ময়ূর হবে পেখমহীন

সুন্দরের সৌন্দর্য যাবে হারিয়ে

সব প্রেমীদের কাছে প্রেম হবে ঝাপসা স্বপ্ন

যেন অস্ত যাওয়া তারা

যেন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কল্পনা

সময় হবে স্তব্ধ, স্রোতহীন

জগতে শুধু মৃত্যুর রাজত্ব হবে

মৃত হৃদয়ের লাশের মেলা বসবে

রোমান্টিকতার নামে বেরোবে গ্রেফতারি পরোয়ানা

ভালোবাসার ওপর জারি হবে একশ চুয়াল্লিশ ধারা।

সৌগত খাঁ

ফোন নাম্বার : 9547515096

সেই তুমি, নেই তুমি

– বন্দ্যোপাধ্যায়

রয়ে গিয়েছে বাকি আজ অনেক কিছুই,

পরে রয়েছে যথাস্থানে

যে যার মতন করে ।

নদের সঙ্গী দমকা বাতাস

মাখছি আজও গায়ে,

মাখছিনা শুধু স্রোতের কোলাকুলি

আলতো পায়ে পায়ে।।

গঙ্গার বুকে ডিঙির পাল

আজও চলেছে বয়ে

বইছেনা শুধু আদুরে বাতাস

যাচ্ছে, সবই সয়ে ।।

তিলোত্তমার আকাশরেখা

খেলছে আজও স্রোতের বুকে,

খেলছেনা শুধু নয়নদুটি

নিটোল স্পর্শে, ভুলচুকে।।

চায়ের ভাঁড়েতে পড়ছে চুমুক

তবে সংখ্যাটি আজ একে,

ভাবনাগুলি নিচ্ছে কেড়ে

অবসরটুকু,

সময়ের ফাঁকে ফাঁকে।

প্রিন্সেপের ক্যানভাসখানি

আজও বলছে গল্প, শুনছি আমি

শুধু গল্পখানির শিরোনামেতে

সেই তুমি, নেই তুমি ।।

একদিন দেখা হবে

- সাইমোউন মোরসেদ রিয়াদ

বিশ্বাস করেন একদিন আমাদের দেখা হবে।

তবে টানটান উত্তেজনা থাকবে না।

একদিন আমাদের দেখা হবে।

তবে আমাকে দেখে হাসির বদলে চোখ লুকানোর চেষ্টা তোমার থাকবে।

একদিন আমাদের দেখা হবে।

তবে তুমি আমার পছন্দের পোশাক পরা থাকবে না।

একদিন আমাদের দেখা হবে।

তবে আগামি দেখা হবার দিনক্ষণ আমরা করব না।

একদিন দেখা হবে।

তবে সেদিন তুমি আমার হাতটা আর ধরবে না।

একদিন দেখা হবে।

তবে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার বদলে থেমে যাবে।

একদিন দেখা হবে।

তবে ভালোবাসা থাকবে না।

একদিন দেখা হবে।

পথে ঘাটে কোন এক অলিতে গলিতে। অথবা

আমি রিকশায় তুমি যাচ্ছো হেঁটে।

অথবা বৃষ্টিতে বাঁচতে দুজনই এক ছাউনির আশ্রয় নিতে গিয়ে।

হয়ত সেদিন মুখ লুকিয়ে অন্য পথে হাঁটা দেবো।

চোখের পানি খুব লুকিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মুছে নিবো।

একদিন দেখা হবে ....

তবে সেদিন আমি তোমার আর তুমি আমার থাকবে না।

মূলত একদিন দেখা হবে কিন্তু সব আগের মত থাকবে না।☺

॥এক দিন দেখা হবে॥একদিন দেখা হবে।

কলমে : সাইমোউন মোরসেদ রিয়াদ

ঠিকানা ঃ বাংলাদেশ

॥এক দিন দেখা হবে॥

সেই ট্র্যাডিশন

- সুকান্ত লাহা

জেরুজালেমে ঘোড়ার আস্তাবলে

যীশুর জন্মাতে তখনও

তিনশো চুরাশি বছর দেরি ;

জন্ম নিলেন এ্যারিস্টটল!

শুধু গ্রীস নয়

সারা বিশ্ব নড়েচড়ে উঠলো

মানুষটার কথাবার্তায়!

গ্রীক বীর আলেকজান্ডারকে

টিউশন পড়িয়ে ফেরার পথে

গার্জেনদের জটলায় দাঁড়িয়ে

বললেন,

"শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতো হলেও ফল মিষ্টি" ;

এতগুলো বছর পরে

মানুষটা নেই,

রয়ে গেছে কথাগুলো

আগুনের মতো সত্যি হয়ে!

তারও আগে

এথেন্স একাডেমির বারান্দায় দাঁড়িয়ে

সোচ্চার কণ্ঠে

বলে গেলেন প্লেটো,

"রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহার

অন্যতম শাস্তি হলো

নিজের চেয়ে নিকৃষ্টদের দ্বারা শাসিত হওয়া!"

মিথ্যে নয়!

মিথ্যে নয় কথাগুলো!

দুহাজার ছশো বছর আগেই বোধহয়

মানুষটা জানতেন

এমএলএম এমপি হয়ে

বিধানসভা কিংবা পার্লামেন্টে পৌঁছাতে গেলে

এমএ এমএসসি পিএইচডি

অথবা

মিনিমাম কোনো কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন নেই

বরং

এমএ এমএসসি পিএইচডি'রাই

নন ম্যাট্রিক এমএলএম এমপি'দের পিছনে

হাত কচলাতে কচলাতে

স্যার স্যার করে ঘুরবে!

তার চেয়েও বহু আগে

পৃথিবীতে যীশু আসার

চারশো সাতাশ বছর আগে

হেমলক ভর্তি কাপে

নিশ্চিন্তে চুমুক দিতে দিতে

প্লেটোর মাস্টারমশায় সক্রেটিস বলে গেলেন,

"এমন একটা সময় আসবে

যখন জ্ঞানীরা জ্ঞানী হবার কারণে

অনুশোচনা করবে,

মুর্খরা তাদের মুর্খতার জন্য

গর্ব করবে,

আর দুর্নীতিবাজেরা তাদের দুর্নীতির জন্য

উল্লাস করবে!"

সক্রেটিস থেকে শুরু করে

প্লেটো এ্যারিস্টটল হয়ে

জিওর্দানো ব্রুনো কোপারনিকাস গ্যালিলিও ---

রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্লজ্জতার

ধারাবাহিক ইতিহাস ;

সত্যের কন্ঠরুদ্ধ করার ট্র্যাডিশনাল বর্বরতা ;

যার লেটেস্ট বাংলা ভার্সন :

"মাস্টারমশাই, আপনি কিছুই দেখেননি!"

পৃথিবীর মোস্ট সিনিয়র মাস্টারমশাই

সবকিছু দেখেশুনে

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও

হাসতে হাসতে তুলে নিলেন

এ কাপ ফুল অফ হেমলক ;

দাউদাউ আগুনে

পুড়ে গেলেন জিওর্দানো ;

নিশ্ছিদ্র খুপরিতে

মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

গ্যালিলিও উচ্চারণ করে গেলেন,

ইট মুভস্

ঘুরছে, ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে!

হ্যাঁ! ঘুরছে!

পৃথিবী ঘুরছে!

আজও ঘুরেই চলেছে

ঘুরবেও অনন্তকাল ---

এটা বিলাসিতা নয়, বিজ্ঞান ;

আর মাস্টারমশাইও সবকিছু দেখছেন, এটা বিশ্বাস!

জীবন, তুমি একটু চল ধীরে

– গুলজার সাহেব

জীবন, তুমি একটু চলো ধীরে,
আর ক'টা দিন তোমার সাথেই থাকি
আমার আর একটু কাজ বাকি।

সইতে হবে আরো দহন জ্বালা,
বইতে হবে আরও ব্যথার ভার
আর কিছুদিন কষ্টযাপন বাকি,
আর একটু নয় নামবে অন্ধকার।

হারিয়ে গেল অনেক কিছু দামী,
ফুরিয়ে গেল অনেক ফাগুনবেলা।
জীবন মানেই জলরং এক ছবি,
স্বপ্ন আঁকা,স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলা।

কাছের যারা অনেকে আজ দূরে,
কেউ দিয়েছে পথের মাঝেই আড়ি।
এখনো কিছু রক্তক্ষরণ বাকি,
এখনো কিছু আঁধার পথে পাড়ি।

এখনো কিছু স্বপ্ন- কুঁড়ি মনে,

এখনো কিছু কর্তব্যের ঋণ।

এখনো কিছু আর্ধেক-চলা পথ,

এখনো কিছু রুদ্রপলাশ দিন।

জীবন,তুমি একটু চলো ধীরে,

আর ক'টাদিন তোমার সাথেই থাকি।

আমার আর একটু কাজ বাকি।

কলমে ⊷ গুলজার সাহেব ।

দুগ্গা পুজো

- শ্রেয়সী গুপ্ত

শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা ভোরের নতুন আলো,

কাসর ঘন্টা বাজছে দেখো, ওই বুঝি মা এলো।

চারিদিকে ঢ্যাংকুড়াকুর, ঢাকের কত আওয়াজ

ছোট থেকে বড়দের শুধুই খুশির মেজাজ।

সপ্তমীতে পাড়ার পুজো, অষ্টমী তে রাজবাড়ি

অঞ্জলি দিতে গিয়ে ,পাঞ্জাবি আর লাল শাড়ি।

নবমীতে পুরোনো বন্ধু , ছোট বেলার স্মৃতি

এবার মায়ের যাওয়ার পালা, এটাই যে রীতি।

দশমী তে সিঁদুর খেলা , মন খারাপ আর শান্তনা

আসছে বছর আবার এস মা, এটাই করি প্রার্থনা।

বিজয়া তে সম্মেলন আর নাড়ু খাওয়ার প্রতীক্ষা

আবার এই চারটে দিনের এক বছরের অপেক্ষা।

বছর বছর দুগ্গা পুজো ফিরে ফিরে আসুক ,

সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক।।

লেখকের নাম - শ্রেয়সী গুপ্ত

লেখকের ফোন নং – 9641522820

অজেয় স্বপ্ন

- দেশব্রত বিশ্বাস

রাস্তার ধারে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমায় যে লোকটা,

সেও স্বপ্ন দেখে।

দামী বিছানায় শুয়ে বাহারী রাত্রিবাস চাপানো লোকটা,

সেও স্বপ্ন দেখে।

বিজ্ঞান যদিও বলে স্বপ্নের রং ধূসর, সাদা, কিম্বা কালচে,

সে তত্ব মানলে দু'জনের স্বপ্নের রংগুলো প্রায় একই

দু'জনেই স্বপ্ন দেখে উন্নতির, উত্থানের, উঁচু, আরেকটু উঁচু থেকে অনেকটা উঁচু।

অবশ্য সব স্বপ্ন উচ্চতায় পৌঁছায় না,

কিছু স্বপ্ন উচ্চতা থেকে পতনের শংকাও জাগায়,

সামলে নিতে পারলে ভালো, নইলে আগামী দিনকতক চোট বইতে হয়।

যার পতন যত উঁচু থেকে, তার চোট তত গভীর।

মাটির বুকে চালচুলোহীন লোকটা

কেবল এখানেই জিতে যায়,

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান পেলেই যার জীবন সার্থক

তার আবার পতনে কিসের ভয়?

সৃষ্টি সুখের উল্লাসেঃ

কলমে - দেশব্রত বিশ্বাস

ফোন নং – ৭২৭৮৭২৯৩৩৭

স্নিগ্ধ শারদ সুর

- বিরুপাক্ষ রায়চৌধুরী

অপেক্ষা আর আবেগে কাটাই কত মাস,

উত্তেজনা কিন্তু যে হয়না কভু হ্রাস।

ঢাকে কাঠি পড়তে দেরি, মনে দেয় দোল,

শারদ ঘ্রাণে বেজে ওঠে প্রমোদের এই বোল।

মনে পড়ে শৈশবে সেই রাত্রি জেগে থাকা,

গ্রামের বাড়ি, কাঁচা পথ, পথ আঁকাবাঁকা।

কাশের বনে পুজোর টানে পথ হারিয়ে যাওয়া,

হিয়ার মাঝেই রবে সদা শারদ শুভ্র হাওয়া।

দেবীর আগমনেই আসে আনন্দের ঢেউ,

চারটি দিনের উন্মাদনায় ক্লান্ত হয়না কেউ।

মনের স্পৃহার স্পৃহায় রয় উৎসবের এই গান,

শারদ বেলায় থাকে হেথা মায়ের মায়ার টান।

বিদায় বেলায় বাজে বুকে বিরহের এক সুর,

মিষ্ট সুবাসে যদিও সবাই মজে ভরপুর।

সিঁদুর খেলার পরই মায়ের বিদায় হয়ে যায়,

বাঙালির মন পুনরায় দেয় অপেক্ষাকেই সায়।

পুজোর সাথেই যায় প্রেমের খরস্রোতা বাণ,

শিশিরে ভেজা প্রতিশ্রুতির আকাশছোঁয়া মান।

আছে ক্লেশ, আছে গ্লানি, আছে অনুরাগ,

শারদাকাশের সুরে শুধুই বাজে পূর্বরাগ।।

~বিরূপাক্ষ রায়চৌধুরী

দুর্গাপুর

পশ্চিম বর্ধমান

89675 30042

আলোকচিত্র

।।রঙের আড়ালে মা ।।

শিল্পী - দেবর্ষি দাস
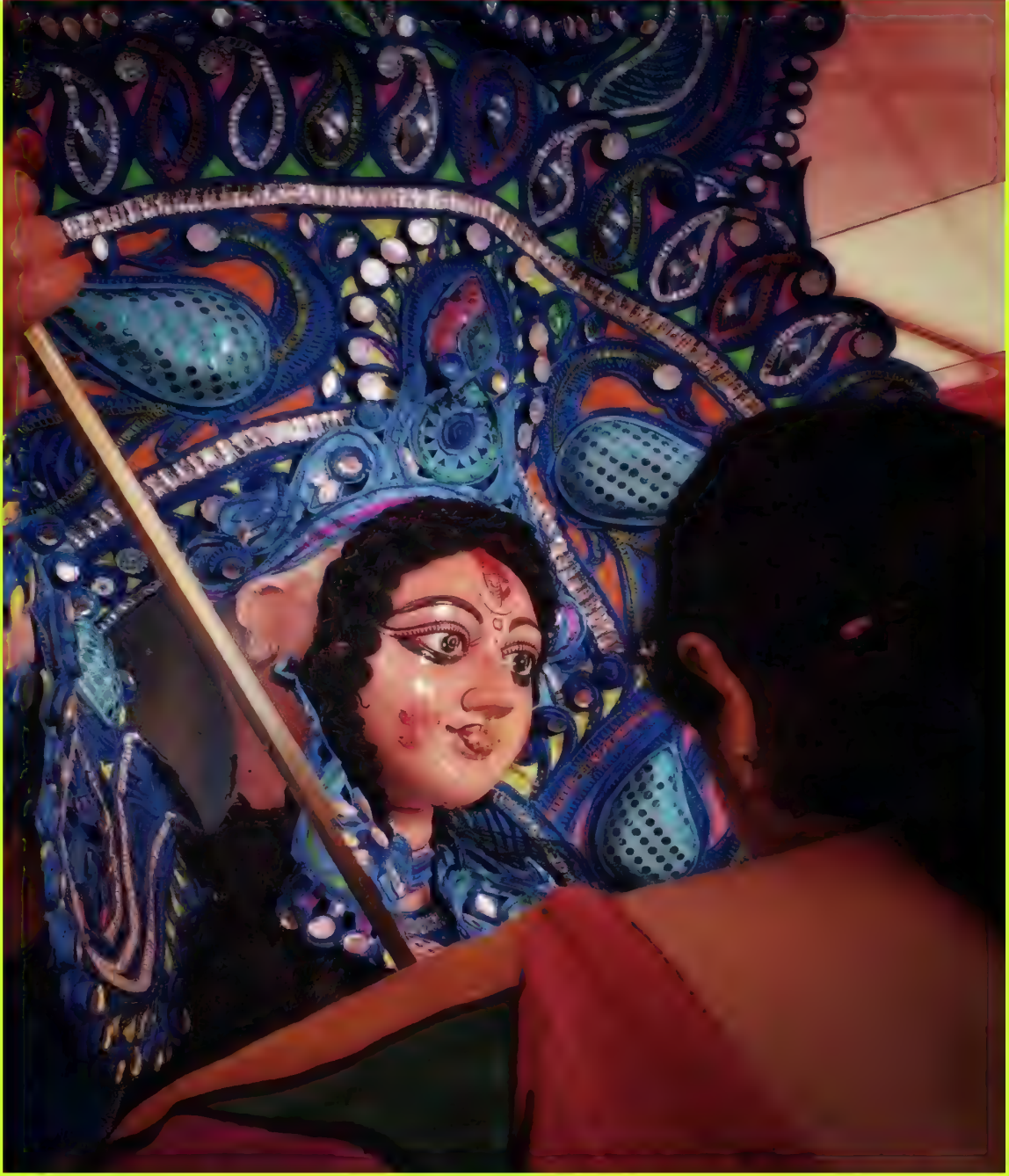
॥ বরণ ॥

শিল্পী - বাপি কুণ্ডু

।। আগমনী ।।

শিল্পী - বন্দ্যোপাধ্যায়

।। মা ।।

শিল্পী - উদিশা মাইতি

।। দীপ জ্বেলে যাই ।।

শিল্পী - সম্প্রীতি সেন

॥ অনন্য শিল্প ॥

শিল্পী - সুদিপ্তা ধর

॥ প্রস্তুতি ॥

শিল্পী - কিশোর দাস

।। ঢাকের কাঠি পড়ল বলে ।।

শিল্পী - অমিত কুমার গোস্বামী

অঙ্কন
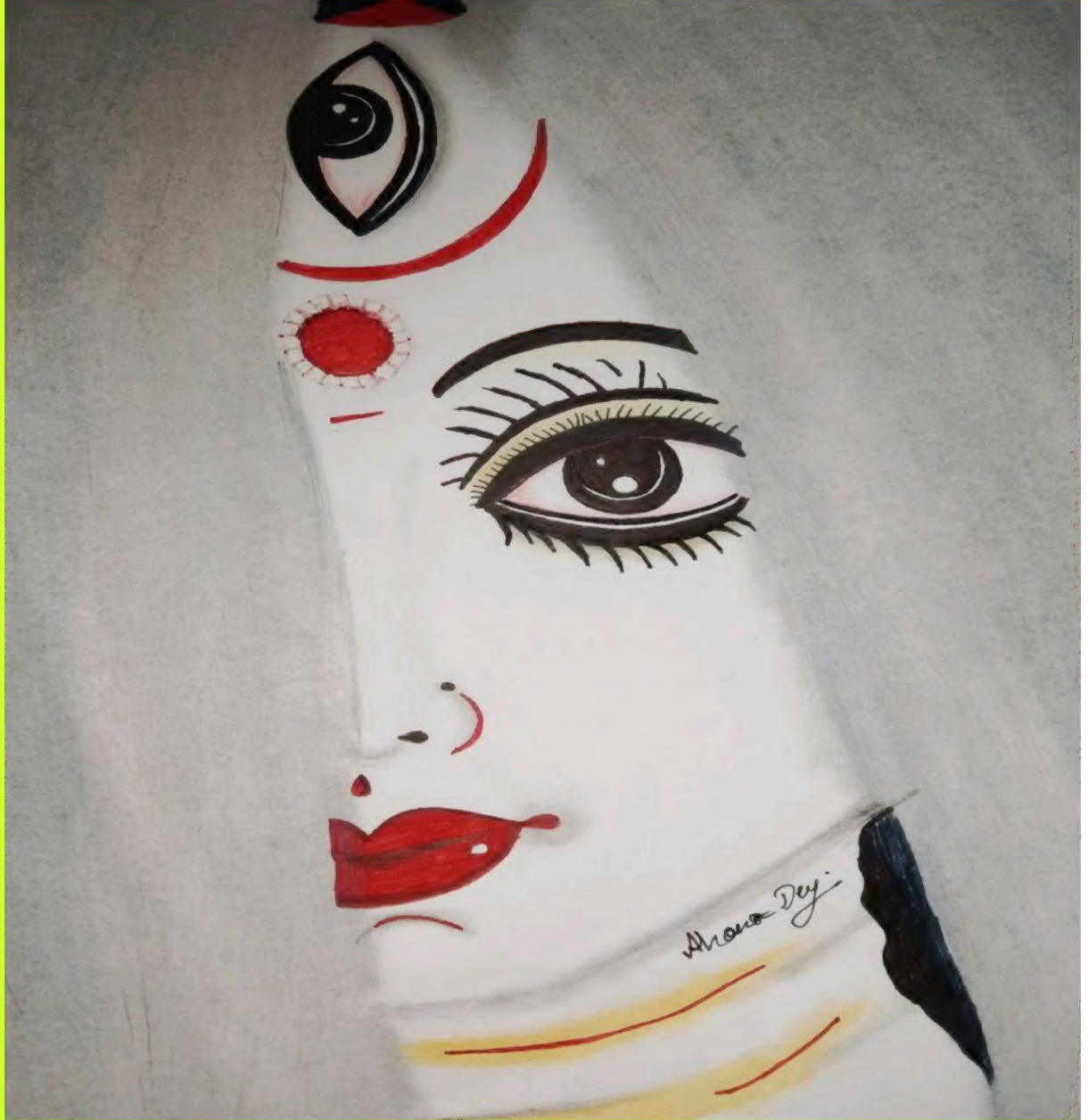
দুর্গতিনাশিনী

শিল্পী - অহনা

।।   ধন্যবাদ   ।।

।।   পরিচালনায় - গল্পগুচ্ছ পরিবার   ।।

____x____

সমাপ্তি